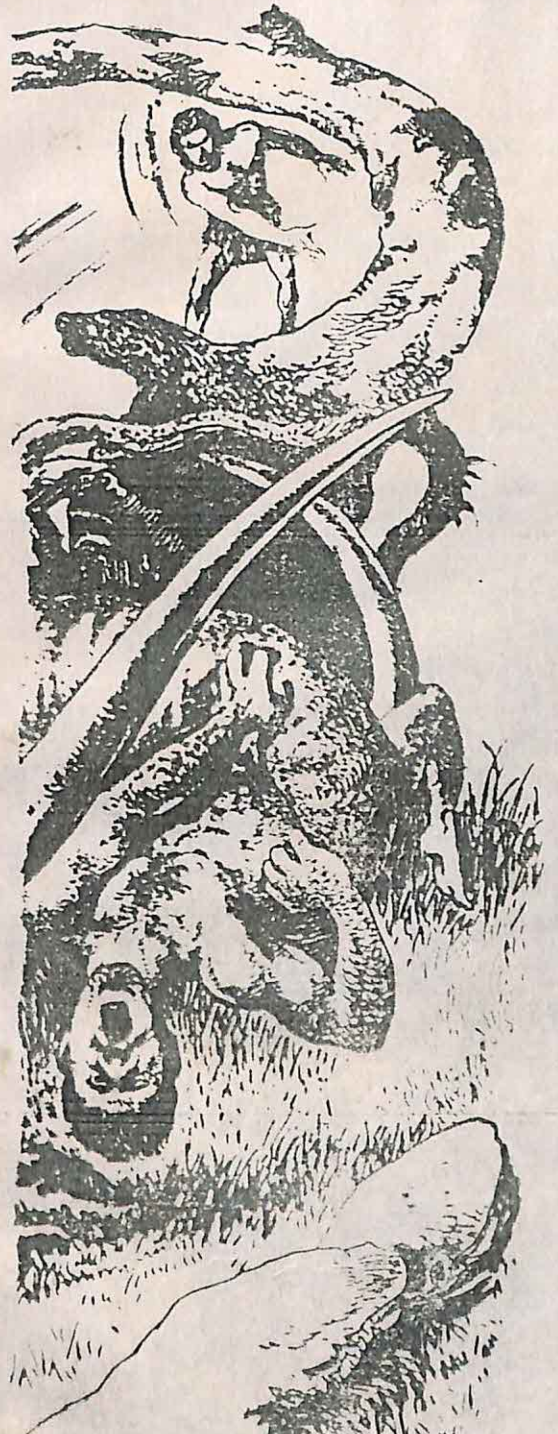
ছোটদের জীবজন্তুর গল্প

সুকুমার রায়







ছোটদের

জীবজন্তুর গল্প

8.1

352

সুকুমার রায়

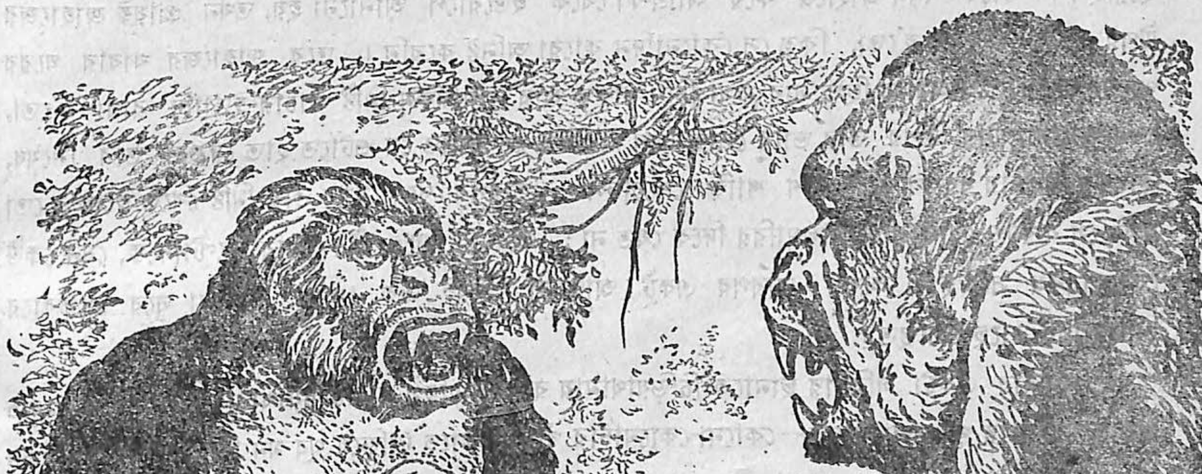
শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ ● ৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

যে সব লেখা আছে

দাম : দশ টাকা

গরিলা

গরিলা থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে। গাছের ডালপালার ছায়ায় সে জঙ্গল দিনদুপুরেও অন্ধকার হয়ে থাকে; সেখানে ভাল করে বাতাস চলে না, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। পাখির গান হয়ত ক্বচিৎ কখনও শোনা যায়। তারই মধ্যে গাছের ডালে বা গাছের তলায় লতাপাতার মাচা বেঁধে গরিলা ফলমূল খেয়ে দিন কাটায়। সে দেশের লোকে পারতপক্ষে সে জঙ্গলে ঢোকে না—কারণ গরিলার মেজাজের তা



ঠিক নেই, সে যদি একবার ক্ষেপে দাঁড়ায়, তবে বাঘ ভালুক হাতি তার কাছে কেউই লাগে না। বড় বড় শিকারী, সিংহ বা গণ্ডার ধরা যাদের ব্যবসা, তারা পর্যন্ত গরিলার নাম শুনলে এগোতে চায় না।

পৃথিবীর প্রায় সবরকম জানোয়ারকেই মানুষে ধরে খাঁচায় পুরে চিড়িয়াখানায় আটকাতে পেরেছে —কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো বড় গরিলাকে মানুষে ধরতে পারেনি। মাঝে মাঝে দুটো-একটা গরিলার ছানা ধরা পড়েছে কিন্তু তার কোনোটাই বেশি দিন বাঁচেনি।

একবার এক সাহেব একটা গরিলার ছানা পুষবার চেষ্টা করেছিলেন, সেটার বয়স ছিল দু-তিন বৎসর মাত্র। তিনি বলেন, তার চালচলন, মেজাজ, দুষ্টুমিবুদ্ধি ঠিক মানুষের খোকার মতো। তাকে যখন ধরে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হ'তো, তখন সে মুখ বেজার করে পিছন ফিরে বসে থাকত। যে জিনিস সে খেতে চায় না সে জিনিস যদি তাকে খাওয়াতে যাও, তবে সে চিৎকার করে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে অনর্থ বাধিয়ে বসবে। একদিন তাকে জোর করে ওষুধ খাওয়াবার জন্য চারজন লোকের দরকার হয়েছিল। তাকে যখন জাহাজে করে আফ্রিকা থেকে ইউরোপে আনানো হয়, তখন প্রায়ই জাহাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'তো, কিন্তু সে কোনোদিন কারো অনিষ্ট করেনি। তবে জাহাজের খাবার ঘরের পাশে যে একটা আলমারি ছিল, যার মধ্যে চিনি থাকত আর নানারকম মিষ্টি আচার ইত্যাদি রাখা হ'তো, সেই আলমারিটার উপর তার ভারি লোভ ছিল। কিন্তু সে জানত যে ওটাতে হাত দেওয়া তার নিষেধ, কারণ দু-একবার ধরা পড়ে সে বেশ শাস্তি পেয়েছিল। তারপর থেকে যখন তার মিষ্টি খেতে ইচ্ছে হ'তো তখন সে কখনও সোজাসুজি আলমারির দিকে যেত না; প্রথমটা যেত ঠিক তার উল্টোদিকে, যেন কেউ কোনোরকম সন্দেহ না করে। তারপর একটু আড়ালে গিয়েই এক দৌড়ে বারান্দা ঘুরে একেবারে আলমারির কাছে উপস্থিত!

একবার একটা গরিলার ছানাকে চিড়িয়াখানায় রাখা হয়েছিল। চিড়িয়াখানায় নানারকম অদ্ভুত জন্তু দেখতে তার খুব মজা লাগত—কোনো-কোনোটার খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে খুব মন দিয়ে তাদের চালচলন দেখত। একটা শিম্পাঞ্জির বাচ্চা ছিল, সে নানারকম কসরৎ জানত—সে যখন ডিগবাজি খেয়ে বা হুটোপুটি করে নানারকম তামাশা দেখাত, গরিলাটা ভারি খুশী হয়ে তার কাছে এসে বসত।

গরিলার চেহারাটা মোটেও শান্তশিষ্ট গোছের নয়—মানুষের মতো লম্বা, চওড়ায় তার দ্বিগুণ, গায়ের জোর তার দশটার মতো—তার উপর সে যখন রাগের চোটে চিৎকার করে নিজের বুকে কিল মারতে মারতে এগোতে থাকে তখন তার সেই শব্দ, মুখভঙ্গি আর রকমসকম দেখে খুব সাহসী লোক পর্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ দেখলেই গরিলা তেড়ে মারতে আসে না—বরং সে অনেক সময়ে মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু তুমি যদি একেবারে তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হও তো সে কি করে বুঝতে পারবে যে তোমার কোনো দুষ্ট মতলব নাই? বিশেষতঃ লোকে যখন লাঠিসোঁটা নিয়ে হৈ হৈ করে জঙ্গলে হাজির হয়, তাতে যদি গরিলা খুশী না হয়, তবেই কি তাকে হিংস্র বলতে হবে?

গরিলার লড়াই

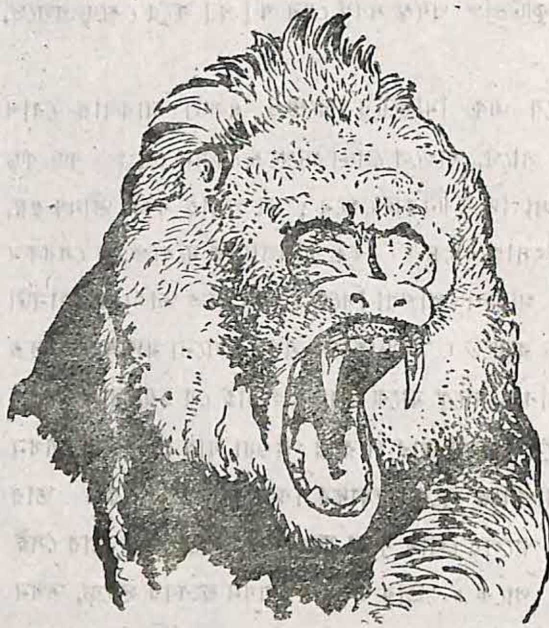
যতরকম বনমানুষ আছে তার মধ্যে, বুদ্ধিতে না হোক, শরীরের বলে গরিলাই সেরা। হাত-পায়ের মাংসপেশীর বাঁধন থেকে তার দাঁড়াবার ধরন আর ভ্রূকুটিভঙ্গি পর্যন্ত সবই যেন খাঁ খাঁ করে তেড়ে বলছে, "খবরদার! কাছে এস না!"

মানুষের মধ্যে এত বড় পালোয়ান কেউ নেই যে এক মিনিটের জন্যেও একটা গরিলার রোখ সামলাতে পারে। কিন্তু গরিলায় গরিলায় যদি লড়াই লাগে, তাহলে সেটা দেখতে কেমন হয়? বড় বড় পালোয়ান কুস্তিগীরের লড়াই দেখতে কত মানুষ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনে; সে লড়াই যতই ভীষণ হয়, হুড়াহুড়ি ধস্তাধস্তি যতই বেশি হয়, মানুষের ততই উৎসাহ বাড়ে। কিন্তু গরিলাদের মধ্যেও কি সেরকম লড়াই বা রেষারেষি লাগে? লাগে বৈকি! এমন গরিলা পাওয়া গিয়েছে যার দাঁত ভাঙা বা কানটা ছেঁড়া, অথবা গায়ে মাথায় অন্য গরিলার দাঁতের চিহ্ন রয়েছে। লড়াইয়ের সময় কোনো মানুষ উপস্থিত থেকে তা দেখেছে, আজ পর্যন্ত এরকম শোনা যায়নি—কিন্তু মাঝে মাঝে এরকম লড়াই যে হয়, নানা রকম গর্জন আর হুঙ্কার আর বুক চাপড়াবার গুম্ গুম্ শব্দে অনেক সময় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গরিলা যখন ক্ষেপে, তখন রাগে সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় আর আপনার বুকে দমাদম কিল মারতে থাকে। তার চোখ দুটো তখন আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে, তার কপালের লোম ফুলে ফুলে খাড়া হয়ে ওঠে আর সেই সঙ্গে নাকের ফস্ ফস্ আর দাঁতের কড়মড় শব্দ চলতে থাকে। তার উপর সে যখন হুংকার ছাড়ে, তখন অতিবড় সাহসী জন্তুও পালাবার পথ খুঁজতে চায়। লোকে বলে, সে হুংকার নাকি সিংহের ডাকের চাইতেও ভয়ানক।

মনে কর, জঙ্গলের মধ্যে কোনো গরিলাসুন্দরীর বিয়ের জন্য দুই মহাবীর পাত্র এসেছেন। দুজনেই তাকে ভালবাসে, দুজনেই তাকে চায়, কেউ দাবি ছাড়তে রাজী নয়। এমন অবস্থায় পশুপাখির মধ্যে সর্বত্রই যা হয়ে থাকে, আর পুরাণের বড় বড় স্বয়ংবর সভাতেও যেমন হয়ে এসেছে, এখানেও ঠিক তাই হওয়াই স্বাভাবিক। তখন দুই বীর আপন আপন তেজ দেখিয়ে লড়াই করতে লেগে যায়। সে ভীষণ লড়াই যে একটা দেখবার মতো ব্যাপার তাতে আর সন্দেহ কি? গরিলার চড় আর গরিলার ঘুষি, যার একটি মারলে মানুষের ভুঁড়ি ফেঁসে যায়, মাথার খুলি দু'ফাঁক হয়ে যায়, সে কেবল গরিলার গায়েই সয়। সেই চট্পট্ দুম্দুম্ কিল চড়ের সঙ্গে খাম্চাখাম্চি আর কামড়াকামড়িও নিশ্চয়ই চলে। এইরকমে যতক্ষণ না লড়াইয়ের মীমাংসা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ এক পক্ষ হার মেনে চম্পট না দেয়, ততক্ষণ হয়ত গরিলাসুন্দরীর চোখের সামনেই এই ভীষণ কাণ্ড চলতে থাকে। সে বেচারা হয়ত চুপ করে তামাশা দেখে, কিংবা দুজনের মধ্যে কাউকে যদি তার বেশি পছন্দ হয়, তবে তার পক্ষ হয়ে লড়াইয়ে একটু-আধটু যোগ দেওয়াও তার কিছু আশ্চর্য নয়।

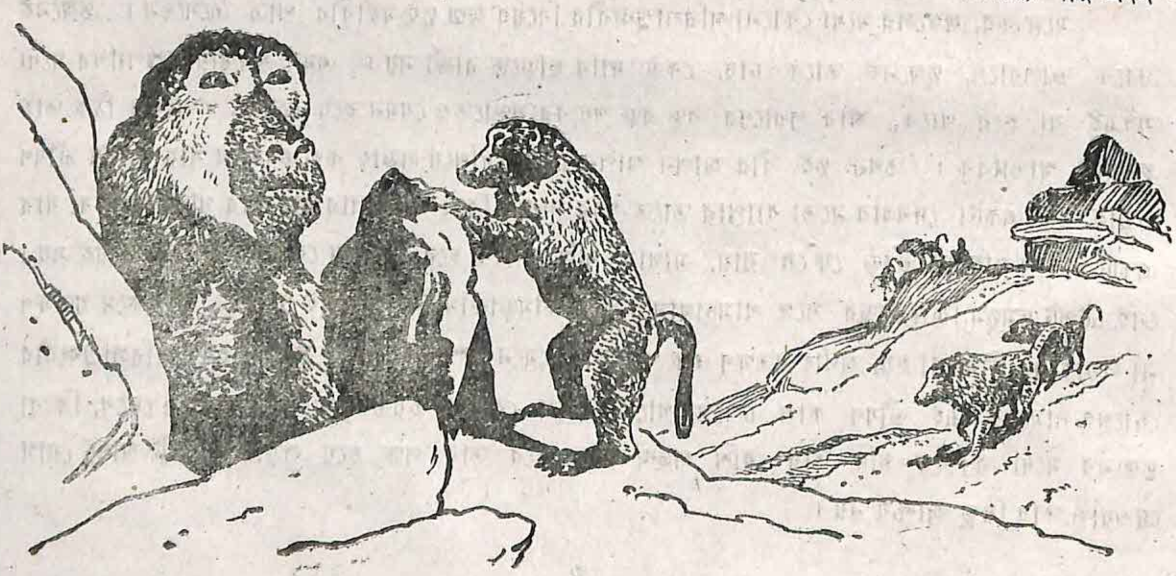
বেবুন

যেসব বানরের মুখ কুকুরের মতো লম্বাটে, যারা চার পায়ে চলে, যাদের ল্যাজ বেঁটে আর গালের মধ্যে থলি আর পিছনের দিকটায় কাঁচা মাংসের মতো ঢিপি, তাদের নাম বেবুন। বেবুনের আসল বাড়ি আফ্রিকায়, কেউ কেউ এশিয়াতেও থাকেন। বেবুন বংশের অনেক শাখা—হলদে বেবুন, লালমুখো বেবুন, ঝুঁটি-ওলা কালো বেবুন, চিত্রমুখ সং-বেবুন বা ম্যানড্রিল, চাকমা বেবুন, ড্রিল বেবুন ইত্যাদি। কিন্তু সকলেরই মুখের ভঙ্গি চালচলন ও স্বভাব প্রায় একইরকম। উঁচু উঁচু ধারাল দাঁত, বদ্‌খত মেজাজ আর তার চাইতেও বদ্‌খত চেহারা। সমস্ত জানোয়ারদের মধ্যে বিদঘুটে চেহারা যদি কারও থাকে তবে সে ঐ ম্যানড্রিলের। টকটকে লাল নাক, খাঁজকাটা নীল গাল, ভেংচিকাটা ভ্রূকুটি মুখ, সব মিলে অপূর্ব চেহারাখানা হয়।

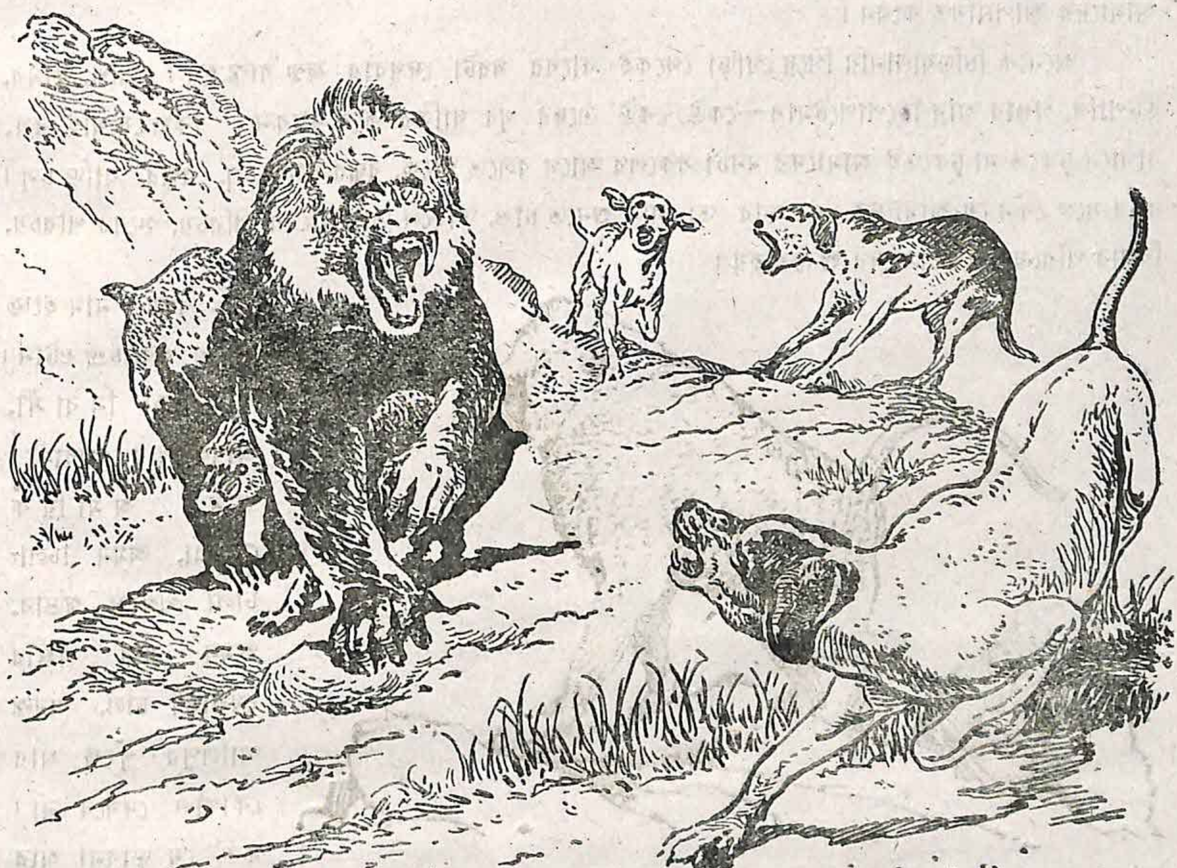


ম্যানড্রিল বেবুন শত্রুকে ভয় দেখাচ্ছে

আফ্রিকার পাহাড়ে জঙ্গলে বেবুনেরা দল বেঁধে লুকিয়ে থাকে। 'বল, বুদ্ধি, ভরসা' এই তিন জিনিসের জোরে সে নীচের জমিতে নেমে এসে চাষীর ক্ষেতের উপর অত্যাচার করে ফল ফসল খেয়ে পালায়। তাদের দল বাঁধবার কায়দা আর পথঘাট পাহারা দেবার ব্যবস্থা এমন চমৎকার, আর এমন



হঠাৎ এসে লুটপাট করে তারা ফস্ করে পালায় যে, চাষীরা তাদের সঙ্গে কিছুতেই পেরে ওঠে না। পালাবার সময় বেবুনেরা কখনও দলের কাউকে ফেলে যায় না—যদি একজন বিপদে পড়ে অমনি পালের গোদারা তাকে সাহায্য করবার জন্য তেড়ে আসে। একবার একটা বাচ্চা বেবুনকে কতকগুলো কুকুরে ঘেরাও করে ফেলেছিল, কিন্তু একটা ধাড়ি বেবুন এসে সেই কুকুরের দলের মধ্যে ঢুকে, এমনি দু-তিন ভেংচি দিয়ে তাদের মুখের সামনে থেকেই সেই বাচ্চাটাকে কেড়ে নিয়ে গেল যে, কুকুরগুলো ভয়ে কিছুই করতে সাহস পেল না—দূরে শিকারীরা পর্যন্ত তার তেজ দেখে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।



ম্যানড্রিল বেবুন কুকুরের মুখ থেকে বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য বেবুনের মতো ম্যানড্রিলের লেজের বাহার নেই, কিন্তু দাঁতের বাহার আছে।

বিপদে পড়লে বেবুনেরা পিছনের পায়ে ভর করে খাড়া হয়ে বসে—শত্রুকে হাতের কাছে পেলেই নখ দিয়ে খামচে টেনে মুখের কাছে নিয়ে এসে, তার পরেই প্রচণ্ড এক কামড়। কামড়ের জোরে হাড়গোড় পর্যন্ত অনায়াসেই গুঁড়িয়ে দিতে পারে। নখ আর দাঁতই হচ্ছে বেবুনের প্রধান অস্ত্র—কিন্তু দরকার হলে তারা পাথর ছুঁড়তেও জানে। বড় বড় পাথর গড়িয়ে শত্রুর মাথায় ফেলতে তারা খুব ওস্তাদ।

আলিপুরের বাগানে

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আমাদের একটি বন্ধু আছেন। আমরা যখনই আলিপুর যাই, অন্তত একটিবার তার সঙ্গে দেখা করতে ভুলি না। দেখা করবার সময় শুধুহাতে যাওয়াটা ভাল নয়, তাই বন্ধুর জন্য প্রায়ই কিছু উপহার নিয়ে যাই। তিনিও তার সাধ্যমতো নানারকম তামাশা কসরৎ ও মুখভঙ্গি দেখিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করেন।

অনেকে চিড়িয়াখানায় গিয়ে গোড়া থেকেই বাঘের ঘরটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হন। সাপ, কুমির, উটপাখি, গণ্ডার আর হিপোপটেমাস—কেউ কেউ এদের খুব খাতির করে থাকেন। কিন্তু যে যাই বল, বাগানে ঢুকতে-না-ঢুকতেই আমাদের মনটা সকলের আগে বলতে থাকে, বন্ধুর বাড়ি চল্, বন্ধুর বাড়ি চল্। বন্ধুর সঙ্গে কেন যে আমাদের এত ভাব তা যদি শুনতে চাও, তাহলে তার নামের পরিচয়, গুণের পরিচয়, বিদ্যার পরিচয় সব তোমাদের শুনতে হয়।



ইয়েলো বেবুন

বন্ধুটির নাম হচ্ছে শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান। আফ্রিকা নিবাসী, আলিপুর প্রবাসী। অমন অমায়িক চেহারা, অমন ঢিলা-ঢালা প্রশান্ত স্বভাব, অমন ধীর গম্ভীর মেজাজী চাল, সমস্ত আলিপুর খুঁজে আর কোথাও দেখবে না। কত যে ভাবনা আর কত যে হিসাবপত্র সর্বদা তার মাথার মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে, তার ঐ প্রকাণ্ড কপালজোড়া হিজিবিজি রেখাগুলো দেখলেই তা বুঝতে পারবে। যখন তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে, মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে, পেট চুলকাতে থাকেন, আর তার কালো কালো হ্যাংলা মতন চোখ-দুটি মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে থাকে, তখন যদি তার মনের মধ্যে কান পেতে শুনতে পারতে, তাহলে শুনতে সেখানে অনর্গল হিসাব চলছে—'আর চারটে কলা, আর দু' ঠোঙা বাদাম, আর কতকগুলো বিস্কুট, আর ঐ নাম-জানি-না গোল-গোল-মতন অনেকখানি'—ইত্যাদি। যখন তিনি খাঁচার ছাদ থেকে গরাদ ধরে অত্যন্ত ভালমানুষের মতো ঝুলতে থাকেন, আর দুলতে থাকেন—

যেন সংসারের কোনো কিছুতে তার মন নেই—তখন যদি তার মনের কথা শুনতে, তাহলে শুনতে পেতে, তিনি কেবলই ভাবছেন, কেবলই ভাবছেন 'এই লোকটার পাগড়ি না হয় ঐ লোকটার চাদর, না হয় এই সাহেবটার টুপি, না হয় ঐ বাবুটার ছাতা—নেবই নেব, নেবই নেব।'

একদিন আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে দেখি, ওরাংবাবু দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছেন। কোত্থেকে কি করে, কার একটা পাগড়ি তিনি আদায় করেছেন, আর সেইটাকে ছাদের গরাদের উপর থেকে ঝুলিয়ে অপূর্ব দোলনা তৈরি হয়েছে। তিনি দুহাতে তার দুই মাথায় ধরে মনের আনন্দে দুলছেন। তার মুখখানা যেন সদানন্দ শিশুর মতো, নিজের বাহাদুরি দেখে নিজেই অবাক।

হঠাৎ তার কি খেয়াল হ'লো, পাগড়ির একটা দিক ছেড়ে দিয়ে তিনি গেলেন মাথা চুলকোতে। অমনি পাগড়ির একটা মাথা ভারি হয়ে নেমে পড়ল, আর আরেক মাথা আলগা পেয়ে সুড়ুৎ করে গরাদের উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে এল। ব্যাপারখানা বুঝবার আগেই ওরাংবাবু মেঝের উপর চিৎপাৎ। আর কেউ হলে অপ্রস্তুত হ'তো, কিন্তু বন্ধু আমাদের অপ্রস্তুত হবার পাত্রই নন। তিনি পড়েই একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠলেন আর এমনভাবে ফিরে দাঁড়ালেন যেন আগাগোড়া তিনি ইচ্ছা করেই আমাদের তামাশা দেখাচ্ছিলেন। তারপর অনেকখানি ভেবে আর অনেক বুদ্ধি খরচ করে আবার তিনি দোলনা খাটালেন। কাপড়টাকে গরাদের উপর দিয়ে গলিয়ে তার দুটো মাথাকেই যে ধরে রাখতে হয়, এটা বুঝতে তার কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। তিনি পাগড়িটাকে ঝুলিয়ে এক মাথা ধরে টানেন, আর হুস্ করে দোলনা খুলে আসে, তাতে প্রথমটা বেচারার ভারি ভাবনা হয়েছিল।

আমাদের বন্ধুটির নানা রকম বিদ্যা আছে। তিনি পান খেতে ভারি ভালবাসেন। পানটা হাতে দিলে, আগে সেটাকে খুলে পরীক্ষা করে দেখেন, তারপর হাতের মুঠোর মধ্যে মুড়ে টপ্ করে মুখের মধ্যে দিয়ে ফেলেন। যখন পান খেয়ে তার মুখখানা লাল হয়, আর গাল বেয়ে পানের রস পড়তে থাকে, তখন তিনি মাটির মধ্যে থুথু ফেলেন, আর লাল রঙের থুথু দেখে খুশী হয়ে তাকিয়ে থাকেন। একদিন গিয়ে দেখি, তিনি জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে অত্যন্ত লাজুক ছেলের মতো চুপচাপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখে তার কি খেয়াল হ'ল জানি না, তিনি ফুলগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন। শুনেছি, তিনি নাকি লুকিয়ে সিগারেট খেতেও শিখেছেন, আর সুযোগ পেলে মালীদের হুঁকোতেও দু-এক টান দিতে ছাড়েন না।

বন্ধু গানবাজনার সমজদার কিনা, অথবা 'সন্দেশ' পড়তে পারেন কিনা, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাইনি, কিন্তু তিনি যে সুগন্ধ জিনিসের কদর বোঝেন, তার পরিচয় অনেক পেয়েছি। তুলোয় করে খানিকটা এসেন্স দিয়ে দেখেছি, সেই তুলোটুকু নাকে ঠেকিয়ে শুঁকতে শুঁকতে আরামে তার দুই চোখ বুজে আসে, জোরে জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে, তিনি চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ শুঁকে শুঁকে তারপর তুলোটাকে যত্ন করে তুলে রেখে দেন, আর থেকে থেকে ফিরে এসে তার গন্ধ শোঁকেন। একবার আমরা তামাশা দেখবার জন্য তুলোয় করে খানিকটা ঝাঁঝালো অ্যামোনিয়া দিয়েছিলাম। সেটাকে শুঁকে যেরকম অদ্ভুত চোখমুখের ভঙ্গি তিনি করেছিলেন, আর যেরকম করে বার বার হাতে আর রেলিঙে নাক ঘষেছিলেন, সেকথা মনে হলে আজও আমাদের হাসি পায়। একবার শুঁকেও

তার কৌতূহল মেটেনি, খুব সাবধানে দূর থেকে আরও দু-চারবার তুলোটাকে শুঁকে, আর দু-চারবার চমৎকার মুখভঙ্গি করে, তিনি সেটাকে তার প্রতিবেশী এক বেবুনের ঘরের মধ্যে ফেলে দিলেন। সেই হতভাগা বেবুনটাও, কথা নেই বার্তা নেই, তুলোটুকু নিয়েই ঝপ্ করে মুখে দিয়ে ফেলেছে। তারপর যদি তার দুরবস্থা দেখতে! অনেকক্ষণ পর্যন্ত নাক রগড়িয়ে হাঁচতে হাঁচতে, আর হাঁ করে জিভের জল ফেলতে ফেলতে বেচারা অস্থির।

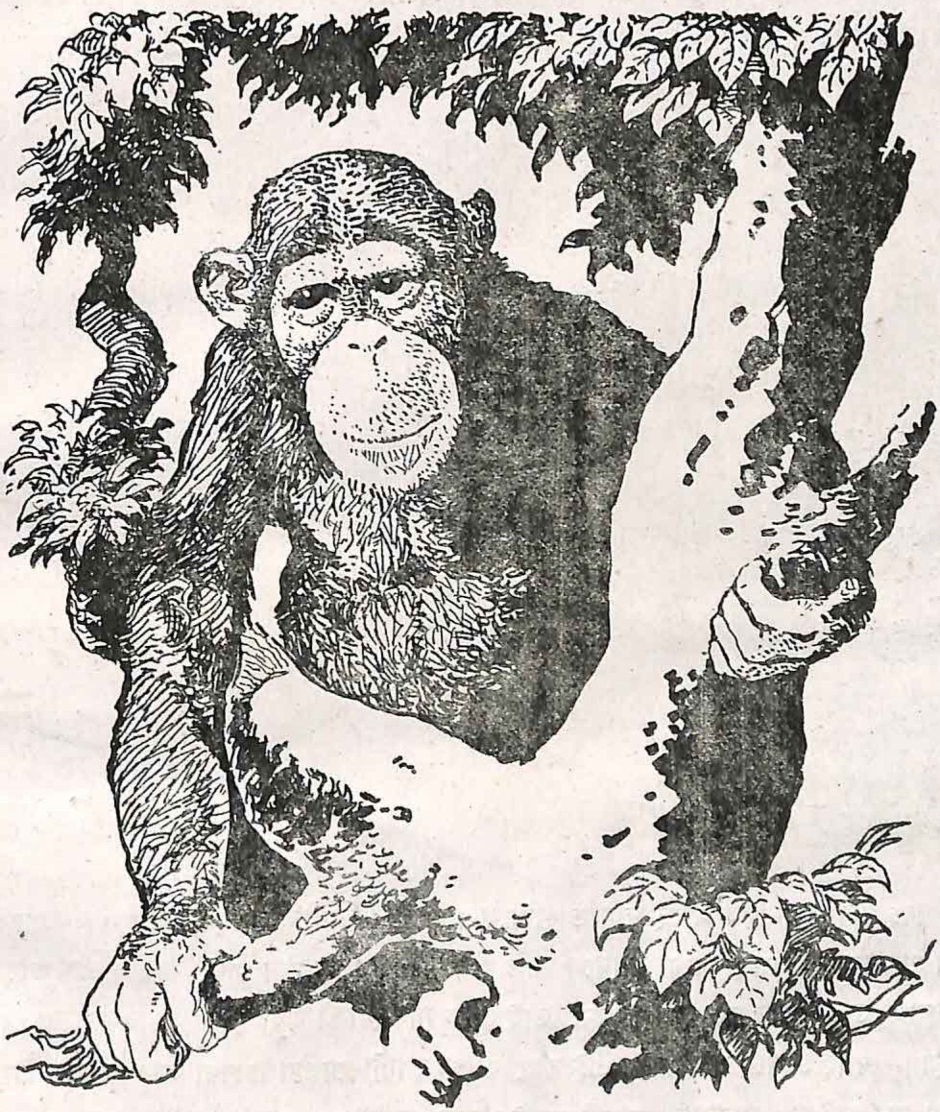


এই বেবুনটার সঙ্গে ওরাং ওটানের একটুও ভাব নেই। আরেকবার ওরাংবাবু আমাদের কাছ থেকে একটা লাঠি আদায় করেছিলেন। লাঠিটা পেয়েই তিনি ব্যস্তভাবে বাইরে গিয়ে, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তার নিশ্চিন্ত প্রতিবেশীর ঘাড়ের উপর এক খোঁচা। তখন যদি বেবুনের রাগ দেখতে! আমরা সে-বার দুই খাঁচার মাঝখানে কলা গুঁজে দিয়ে, বেবুন আর ওরাঙের ঝগড়া দেখেছিলাম। বোকা বেবুনটা যতক্ষণে আঁচড় কামড় আর কিল ঘুষি চালাতে থাকে, ততক্ষণে ওরাংবাবু গম্ভীরভাবে ঘাড় গুঁজে কলাটুকু বার করে নেন। কলাটি নিয়ে মুখে দিয়ে তারপর তার উল্লাস আর ভেংচি। বেবুনটা রাগে যতই পাগলের মতো হয়ে উঠতে থাকে, বন্ধুর ততই ফূর্তি বাড়ে।

এসব কথা কিন্তু চুপিচুপি খালি তোমাদের কাছেই বললাম। তোমরা আলিপুরের কর্তাদের কাছে কক্ষণো এসব ব'লো না; তাহলে আমাদের বাগানে যাওয়া মুশকিল হবে।

মানুষমুখো

বাঁদরের মুখের চেহারা যে অনেকটা মানুষের মতো তা দেখলেই বোঝা যায় ; বিশেষতঃ ওরাং ওটান, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বুদ্ধিমান্ বাঁদরদের চালচলন আর মুখের ভাব দেখলে মানুষের মতো আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাঁদর আছে তাদের মাথার লোমগুলি দেখলে ঠিক টেরিকাটা মানুষের মাথার মতো



মনে হয়, যেন কেউ চিরুনি দিয়ে চুল ফিরিয়ে সিঁথি কেটে দিয়েছে। এক ধরনের বাঁদরের যেরকম গোঁফের বাহার খুব কম মানুষেরই সেরকম আছে। তার বাড়ি আমেরিকায়। ছোট্ট আধ হাত উঁচু বাঁদরটি, কিন্তু

ওই গোঁফের জন্যে তার মুখে একটা গাম্ভীর্যের ভাব দেখা যায়। এদের রং কালো, হাতে লম্বা লম্বা নখ থাকে, তাই দিয়ে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে খাম্‌চিয়ে ওঠে। এই জাতীয় বাঁদরের নাম টামারিন্‌। এদের সকলের একরকম গোঁফ থাকে না ; গুঁফো বাঁদরদের এম্পারার টামারিন্‌ অর্থাৎ সম্রাট টামারিন্‌ বলে। তা সম্রাটের মতো চেহারাই বটে। সম্রাটের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কলা। গুঁফো বাঁদরের পর দাড়িওয়ালা বাঁদর, তার নাম হচ্ছে কালো সাকী। তারও বাড়ি আমেরিকায়। সে দেশের লোকেরা এই বাঁদরকে শয়তান বাঁদর বলে। এরকম অন্যায় নাম দেবার কোনোই কারণ পাওয়া যায় না, কারণ এদের মেজাজ যেমন ঠাণ্ডা, স্বভাবও তেমনি নিরীহ। দাড়ির বহর যতই হোক না কেন, আসলে এরা ভীতুর একশেষ। মানুষের কোনো অনিষ্ট করা



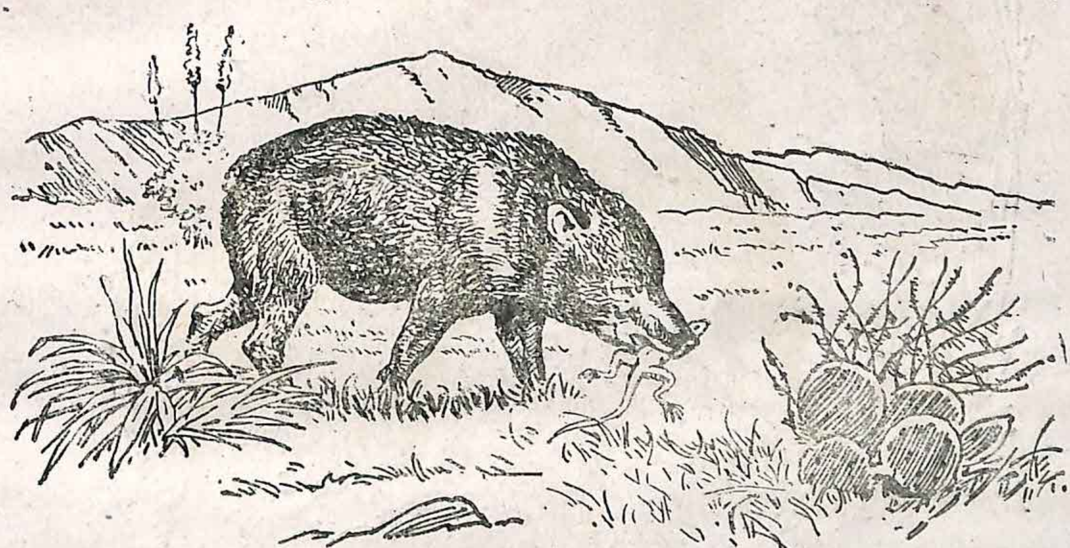
দূরে থাক, কাছে কোথাও মানুষ আছে জানতে পারলে এরা তার ত্রিসীমানা ছেড়ে পালায়। এদের কোনো রকমে পোষ মানানো যায় না ; ধরে আনলে অতি অল্প দিনের মধ্যে মরে যায়। আর এক জাতের সাকী বাঁদর রয়েছে। তার গায়ের রং খুব হাল্‌কা, তাই একে সাদা সাকী বলা হয়। তার চেহারা যেন আরো উদ্ভট গোছের। দাড়িও অন্য রকমের। এই রকমের গালপাট্টা দেওয়া চেহারা আর বিকট থেবড়ানো মুখ দেখে বুঝবার জো নেই যে, বেচারার স্বভাবটি মোটেও তার চেহারার মতো নয়।

বুড়ো-ধাড়ি সিন্ধুঘোটকদের চেহারাও অনেক সময় খুব মাতব্বর গোছের মানুষের মতো মনে হয়। গোঁফ দাড়ি, মাথায় টাক, সবই বেশ মানিয়ে যায়, কেবল হাতির মতো প্রকাণ্ড দাঁত দুটোতেই সব মাটি করে দেয়।

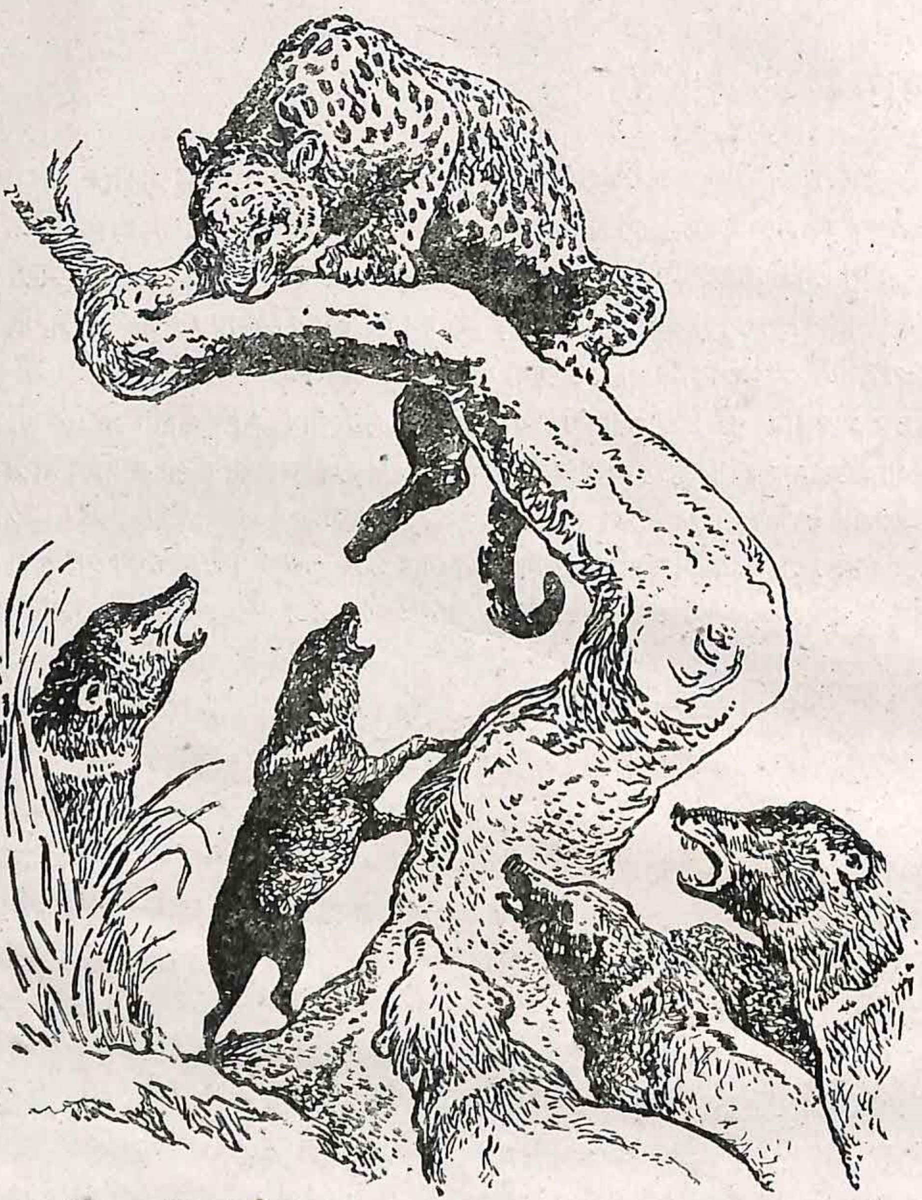
পেকারি

'পেকারি' কি জানো ? দক্ষিণ আমেরিকায় একরকম শুয়োর আছে তার নাম পেকারি। আমাদের দেশী এক-একটা বড় বড় বরাহের কাছে পেকারি যেন কুকুরের পাশে ইঁদুরটা। বেশ বড় একটি পেকারি হয়ত একটি সাধারণ ছাগলের চাইতে বড় হবে না। কিন্তু পেকারিকে ভয় করে না, এমন জানোয়ার সে-দেশে কম আছে। তার কারণ পেকারিরা সব সময় বড় বড় দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটা দলে এক-এক সময় চল্লিশ-পঞ্চাশটা পর্যন্ত পেকারি থাকতে দেখা যায়।

পেকারির প্রধান শত্রু 'জাগুয়ার'। যত রকম চিতে বাঘ আছে তার মধ্যে এই জাগুয়ারই সব চাইতে বড় আর ভয়ানক। কিন্তু পেকারির দল সামনে পড়লে জাগুয়ার পর্যন্ত মানে মানে পথ ছেড়ে পালায়। একবার একদল সাহেব দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঝোপের মধ্যে থেকে এমনি ভয়ানক ফোঁস্-ফোঁস্ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ আসতে লাগল যে, তাঁরা ব্যস্ত হয়ে চট্‌পট্ গাছে উঠে পড়লেন। উঁচুতে উঠে তারা দেখেন, একটা ভাঙা গাছের ডালের উপর এক জাগুয়ার



চড়ে বসেছে—আর তার চারিদিকে পেকারির দল ভয়ানক গোল বাধিয়ে তুলেছে। জাগুয়ারটা যেখানে বসেছে ততদূর পর্যন্ত তাদের নাগাল পৌঁছায় না, তাই তারা কেবল রাগের মাথায় ফোঁস্-ফোঁস্ করছে। আর গাছের গোড়ায় ঢুঁ মারছে। মাঝে মাঝে এক-একটা লাফ দিয়ে জাগুয়ারটাকে গুঁতো লাগাবার চেষ্টা করছে। কয়েকটা গাছে উঠতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছে, তবু ছাড়ছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরকম থেকে জাগুয়ারটার বোধহয় একটু পরিশ্রম হয়েছিল। সে যেই একটু নড়ে বসতে গেছে, অমনি তার একটা পা হড়কিয়ে ঝুলে পড়েছে। যেমন ঝোলা অমনি পেকারি গিয়ে তার উপর দাঁত দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়েছে। জাগুয়ারটাও একেবারে ক্ষেপে গিয়ে, এক লাফে পেকারিগুলোকে ডিঙিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে



লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু পড়ে আর তাকে উঠতে হ'ল না, মাটিতে ঠেকার সঙ্গে-সঙ্গে পেকারির পাল তার উপর পড়ে, তাকে মাড়িয়ে থেঁতলিয়ে গুঁতিয়ে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলল। জাগুয়ারটা যতক্ষণ বেঁচেছিল, ততক্ষণ সে ধস্তাধস্তি করতে ছাড়েনি। কিন্তু তার উপরে এতোগুলো শুয়োর চেপেছিল যে, মাটিতে পড়বার পর আর তাকে চোখেই দেখা যায়নি। শুয়োরগুলি যদি তাকে আর কিছু নাও করত, তবু শুধু চাপের চোটেই মেরে ফেলতে পারত। জাগুয়ারটা মরে যাবার পরেও পেকারিদের রাগ থামেনি। তারা প্রায় আধঘন্টা পর্যন্ত, থেকে থেকে পাগলের মতো তার উপর তেড়ে যাচ্ছিল। তারপর যখন

পেকারির দল চলে গেল তখন দেখা গেল এগারোটা পেকারি মরে পড়ে আছে, আর জাগুয়ারের রক্ত চামড়া মাংস আর হাড় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পেকারিরা যখন শত্রুর সামনে পড়ে, তখন তারা ধনুকের মতো গোল হয়ে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। যদি শত্রু আপনা থেকে সরে পড়ে তবে ভালই ; কিন্তু সে যদি একটুও তেজ দেখাতে চেষ্টা করে, তবে আর রক্ষা নেই। দলকে দল তার উপর পড়ে তাকে আর আস্ত রাখবে না। সেজন্যে জাগুয়ারেরা কখনও ইচ্ছা করে পেকারির দলকে ঘাঁটাতে চায় না ; অথচ পেকারির মাংস তার অতি প্রিয় খাদ্য। জাগুয়ার সাধারণত গাছের উপর পাতার আড়ালে চুপচাপ লুকিয়ে থাকে। যদি এক-আধটা পেকারি দল থেকে একটু এদিকে ওদিকে গিয়ে পড়ে, সে এক লাফে তার ঘাড় ভেঙে আবার দৌড়ে গাছের উপর উঠে বসে ; সেই সঙ্গে পেকারির দলও একেবারে চিৎকার করতে করতে সেই গাছের চারিদিকে এসে জড়ো হয়। জাগুয়ার ততক্ষণে বেশ একটি উঁচু ডালের উপর হাত পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে থাকে। পেকারির দল সারাদিন কেবল চিৎকার আর দাপাদাপি করুক, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। যখন তারা চলে যাবে, তখন সেও সুযোগ বুঝে সেই আগের মারা পেকারিটাকে খেতে নামবে।

অনেক সময়ে নদীর ধারে কাদার মধ্যে গাছের গুঁড়ির উপর পেকারির দল হুড়াহুড়ি করে খেলে বেড়ায়। সেইখানে কাদামাখা কাঠের চেলার মতো কুমির হাত পা গুটিয়ে শুয়ে থাকে। সে আবার আমাদের দেশের কুমিরের চাইতেও চট্‌পটে—এই দেখছ মড়ার মতো, এর পরেই হয়ত দেখবে পাঁচ হাত লাফ দিয়ে জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পেকারির দল এদিক ওদিক ঘুরে-টুরে যখন সেইদিকে আসে, কুমিরও ল্যাজটিকে টান করে ভাবে 'এইবার সময় এসেছে'। যদি দৈবাৎ এক-আধটা পেকারি খেলতে খেলতে সেই ল্যাজের উপর উঠে পড়ে, তবে আর রক্ষা নেই। নিশ্চয় দেখবে, তার পরের মুহূর্তেই ল্যাজের এক ঝাপটায় পেকারি ভায়া ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে উঠেছেন, তারপর, শূন্যে থাকতে-থাকতেই সেই সাংঘাতিক ল্যাজ চাবুকের মতো ছুটে এসে, আবার এক বাড়িতে তাকে কাদার মধ্যে আছাড় মেরে ফেলেছে।

ব্যাপারটা কি হ'ল, দলের সবাই সেটা ভাল করে বুঝবার আগেই কুমির তার শিকার মুখে নিয়ে আচ্ছা করে ঝাঁকানি দিয়ে জলের মধ্যে নেমেছে। এদিকে পেকারির দল তেড়ে এসে দাঁত উঁচিয়ে তীরের কাছে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটিবার কুমিরের চেহারাটি দেখেই একেবারে চার পা তুলে দে দৌড়। ওই একমাত্র জানোয়ার যার কাছে পেকারির দল ঘেঁসতে সাহস পায় না।

সে-দেশের লোকেরা যে পেকারিকে খুব হিসাব করে চলে, সহজেই বুঝতে পার। একলা পেলেও কেউ তাকে সহজে ঘাঁটাতে চায় না ; কারণ কাছেই তার দলটি আছে কি না জানবে কি করে ? সুতরাং পেকারির সামনে যদি কখনও পড়, তবে আর কিছু করবার আগে সুবিধামতো একটি গাছের উপর চড়ে বসাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

জানোয়ার এঞ্জিনিয়ার

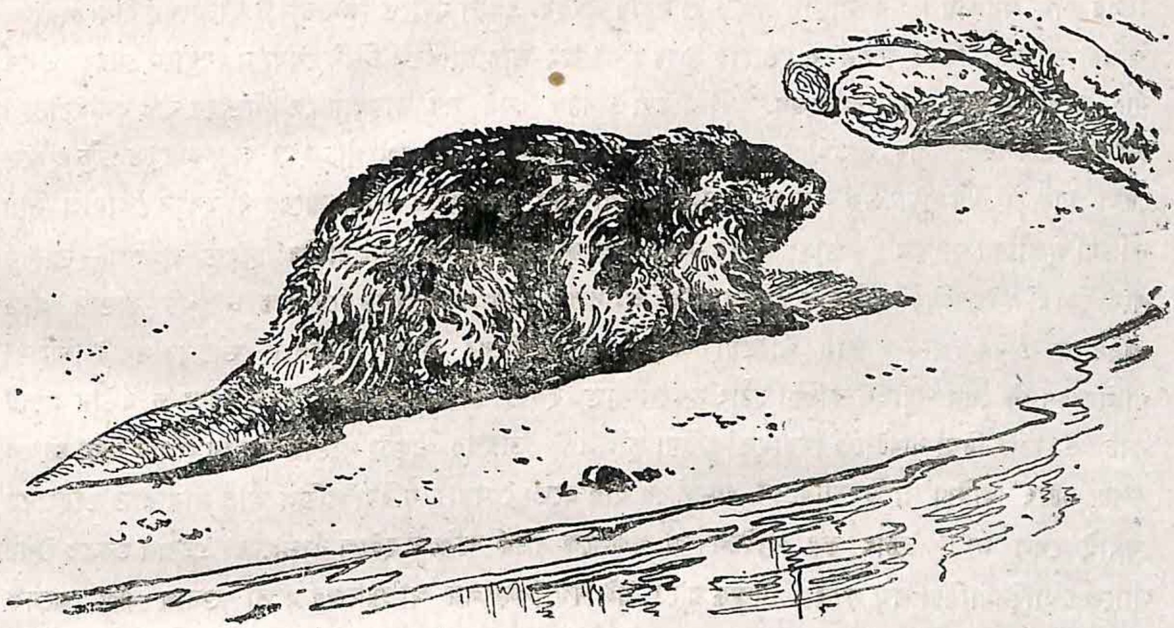
পাখির মধ্যে কাক, আর পশুর মধ্যে শেয়াল—বুদ্ধির জন্য মানুষ ইহাদের প্রশংসা করে। কিন্তু এখন যে জন্তুটির কথা বলিব, তাহার বুদ্ধি শেয়ালের চাইতে বেশি কি না, সেটা তোমরা বিচার করিয়া দেখ। এই জন্তুর বাড়ি উত্তরের শীতের দেশে—বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকায়। ল্যাজসুদ্ধ দুহাত লম্বা জন্তুটি, দেখিতে কতকটা ইঁদুর বা 'গিনিপিগে'র মতো; তাহার চেহারায় বিশেষ কোনো বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহার কাজ যদি দেখ, তবে বুঝিবে সে কত বড় কারিকর। জানোয়ারের মধ্যে এত বড় 'এঞ্জিনিয়ার' আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নাম বীভার।

মৌমাছির চাক, মাকড়সার জাল, পিঁপড়ার বাসা প্রভৃতি অনেক ব্যাপারের মধ্যে আমরা খুব কৌশলের পরিচয় পাই—কিন্তু বীভারের বুদ্ধি কৌশল আরও অদ্ভুত। ইহারা বড় বড় বাঁধ বাঁধিয়া নদীর স্রোত আটকাইয়া রাখে, জঙ্গলের বড় বড় গাছ কাটিয়া ফেলে এবং সেই গাছের 'লাকড়ি' বানাইয়া নানারকম কাজে লাগায়। খাল কাটিয়া এক জায়গার জল আরেক জায়গায় নিতেও ইহারা কম ওস্তাদ নয়। এই সমস্ত কাজে ইহাদের প্রধান অস্ত্র বাটালির মতো ধারাল চারটি দাঁত। বড় বড় গাছ, যাহা কোপাইয়া কাটিতে মানুষের রীতিমতো পরিশ্রম লাগে, বীভার তাহার ঐ দাঁত চারটি দিয়া সেই গাছকে কুরিয়া মাটিতে ফেলে। যেখানে বীভারেরা পল্লী বাঁধিয়া দলেবলে বসতি করে, তাহার আশেপাশেই দেখা যায় যে, অনেকগুলি গাছের গোড়ার দিকে, জমি হইতে হাতখানেক উপরে, খানিকটা কাঠ যেন খাবলাইয়া ফেলা হইয়াছে। এক-একটা গাছ প্রায় পড়ো পড়ো অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে; আরেকটু কাটিলেই পড়িয়া যাইবে। এ সমস্তই বীভারের কাণ্ড। গাছটি যখন কাটা হইল তখন তাহাকে ছোট বড় নানারকম টুকরায় কাটিবার জন্য বীভারের দল ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠে। শীতকালে যখন বরফ জমিয়া যায়, যখন চলাফিরা করিয়া খাবার সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন বীভারের প্রধান খাদ্য হয় গাছের ছাল। সেইজন্য শীত আসিবার পূর্বেই তাহাদের গাছ কাটিবার ধুম পড়িয়া যায়, এবং তাহারা গাছের নরম বাকল কাটিয়া বাসার মধ্যে জমাইতে থাকে।

বীভারের প্রধান আশ্চর্য কীর্তি নদীর বাঁধ; কিন্তু তাহার কথা বলিবার আগে ইহাদের বাসা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। জলের ধারে কাটকুটা ও মাটির ঢিপি বানাইয়া তাহার মধ্যে বীভারেরা স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করে। এই অদ্ভুত বাসায় ঢুকিবার দরজাটি থাকে জলের নীচে, একটা লম্বা প্যাঁচালো সুড়ঙ্গের মুখে। জলে ডুব মারিয়া ঐ সুড়ঙ্গের মুখটি বাহির করিতে না পারিলে বাসায় ঢুকিবার আর কোনো উপায় নাই। বাসার উপরে যে ঢিপির মতো ছাদ থাকে, তাহাই দু-তিন হাত বা তাহার চাইতে বেশি পুরু এবং খুবই মজবুত। এক-একটা ঢিপি প্রায় পাঁচ, সাত বা দশ হাত উঁচু হয়।

শীত পড়িবার কিছু আগেই তাহারা বাসায় ঢুকিবার একটা নূতন সুড়ঙ্গপথ কাটিতে আরম্ভ করে। এই পথটা একেবারে সোজা আর খুব চওড়া হয়—কারণ এইখান দিয়াই তাহারা গাছের ডালপালা আনিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিতে থাকে। এই সুড়ঙ্গেরও মুখটি থাকে জলের নীচে। প্রত্যেক

পরিবারের বীভাররা আপন বাসায় ঢুকিবার পথ জানে এবং প্রত্যেক পরিবার নিজের নিজের খাবার সংগ্রহ করে। কেবল বড় বড় বাঁধ বাঁধিবার সময়ে দুটি-চারটি বা আট-দশটি পরিবার একত্র হইয়া কাজ করে। মেঝের উপর পাতিবার জন্য প্রত্যেক বাসায় কিছু কিছু নরম ঘাসও রাখা হয়। কোনো কোনো জায়গায় আবার বাসার মধ্যে দেয়াল তুলিয়া ছোটদের ঘর, বড়দের ঘর ইত্যাদি নানারকম আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হয়। আবার কোথাও কোথাও দোতলা তিনতলা করিয়াও ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। খাবার সংগ্রহ হইয়া গেলে অনেক সময়ে বড় সুড়ঙ্গটার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। শীতকালে যখন জলের উপরে বরফ জমিয়া যায়, সেই সময়ে বাহির হইবার জন্যও একটা আলগা সুড়ঙ্গের দরকার হয়। এই সুড়ঙ্গটা থাকে বাসার বাইরে—ইহার এক মুখ জলের নীচে, আরেক মুখ উঁচু ডাঙার উপরে। জলের নীচে বাসার দরজা দিয়া বাহির হইয়া তারপর এই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকিয়া তবে বীভারেরা বাহিরে আসে।



বীভারের শরীরের গঠন দেখিলেই বোঝা যায় যে, জলে থাকা অভ্যাস তাহার আছে। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাটালো পা, নৌকার বৈঠার মতো চওড়া চ্যাপ্‌টা ল্যাজ, গায়ের নরম লোমের উপরে আবার লম্বা তেলতেলা লোমের ঢাকনি—এ সমস্তই জলজন্তুর উপযোগী ব্যবস্থা। বাসার কাছে জল না হইলে তাহাদের চলে না, সুতরাং সেখানে যাহাতে বারো মাস যথেষ্ট জল থাকে তাহার জন্য সে নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া জল আটকাইয়া বড় বড় বিল জমাইয়া ফেলে। আর সেই বিলের ধারে বাসা বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। কোথাও বসতি করিবার আগে বীভারেরা দল বাঁধিয়া জায়গা দেখিতে বাহির হয়। যেখানে নদী আছে অথচ স্রোত বেশি নাই, অথবা জল খুব গভীর নয়, সেইরকম জায়গা তাহাদের খুব পছন্দ। জলের ধারে গাছ থাকা চাই আর জায়গাটা বেশ নির্জন চাই, তবেই তাহা ষোলো আনা মনের মতো হয়।

দলের মধ্যে যাহারা বয়সে প্রবীণ তাহারা প্রথমত চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া জায়গা ঠিক করে ; তারপর সকলে মিলিয়া নদীর ধারের আঠালো মাটি আর ছোটবড় লাক্‌ড়ি ফেলিয়া জলের মধ্যে বাঁধ বাঁধিতে থাকে। এক পরত মাটি দিয়া তাহার উপর এক সার লাক্‌ড়ি চাপায় ; তাহার উপরে আবার মাটি ফেলিয়া, তাহার উপর ডালপালা শিকড় জড়াইয়া মজবুত করিয়া গাঁথিয়া তোলে। বাঁধ যতই উঁচু হইতে থাকে, নদীর স্রোত বাধা পাইয়া ততই দুইদিকে ছড়াইয়া পড়ে—আর বীভারেরাও সেই বুঝিয়া বাঁধটাকে ক্রমাগতই লম্বা করিতে থাকে। এমনি করিয়া দেখিতে দেখিতে নদীর মধ্যে প্রকাণ্ড বিল জমিয়া যায়। অনেক সময়ে জলের বেগ কমাইবার জন্য কাছে-কাছে আরও দু-একটা ছোটখাট বাঁধ দেওয়ার দরকার হয়। এ কাজও বীভারেরা খুব হিসাবমত বুদ্ধি খাটাইয়া করে।

এ সমস্ত কাজ করিতে হইলে—জলের স্রোত কোনদিকে, কোথায় কতখানি জল ইত্যাদি অনেক বিষয় জানা দরকার। কানাডার এক এঞ্জিনিয়ার সাহেব একটা নদীতে তিন-চারটি বীভারের বাঁধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তিনি বলেন যে, তাঁহার উপরও কাজের ভার থাকিলে তিনি যেখানে যেখানে যেরকমভাবে বাঁধ রাখা উচিত বোধ করিতেন, বীভারেরাও ঠিক সেই সব জায়গায় তেমনিভাবে বাঁধ বসাইয়াছে। এইরকম এক-একটি বাঁধ এক-এক সময়ে একশ বা দুইশ হাত লম্বা এবং পাঁচ হাত বা দশ হাত উঁচু হইতে দেখা যায়। একবার এক সাহেব তামাশা দেখিবার জন্য রাত্রে একটা বাঁধের খানিকটা কোদাল দিয়া কাটিয়া লুকাইয়া থাকেন। ভাঙা বাঁধের ফাঁক দিয়া হুড় হুড় করিয়া জল বাহির হইতে লাগিল—তাহার শব্দে কোথা হইতে একটা বীভার বাহির হইয়া আসিল—তারপর দেখিতে দেখিতে ৮।১০টি বীভার অতি সাবধানে এদিক ওদিক কান পাতিয়া আস্তে আস্তে বাঁধের কাছে আসিল। তারপর সবাই মিলিয়া খানিকক্ষণ কি যেন পরামর্শ করিয়া হঠাৎ সকলে ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া গেল এবং দু ঘণ্টার মধ্যেই কাঠ ও মাটি দিয়া বাঁধটাকে মেরামত করিয়া তুলিল। তারপর একটা বীভার তাহার ল্যাজ দিয়া জলের উপর চটাৎ করিয়া বাড়ি মারিতেই সকলে যে যার মতো কোথায় সরিয়া পড়িল আর সারারাত তাহাদের দেখাই গেল না। হঠাৎ ভয় পাইলে বা সকলকে সতর্ক করিতে হইলে বীভারেরা এইরূপ জলের উপর ল্যাজের বাড়ি মারিয়া শব্দ করে। নিস্তব্ধ রাত্রে এই শব্দ পিস্তলের আওয়াজের মতো শুনায় এবং অনেক সময়ে একটা আওয়াজের পর সকলের জলে ঝাঁপ দিবার চটাপট শব্দ অনেক দূর হইতে পরিষ্কার শুনিতে পাওয়া যায়। বাঁধ বাঁধিবার জন্য গাছের দরকার হয়। এই গাছ কাটিয়া বড় বড় লাক্‌ড়ি বানাইয়া তাহা বহিয়া লওয়া খুবই পরিশ্রমের কাজ। সেইজন্য বীভারেরা এমন জায়গায় বাসা খোঁজে যাহার কাছে যথেষ্ট গাছ আছে। সেই গাছগুলিকে তাহারা দাঁত দিয়া এমনভাবে কাটে যে গাছগুলি পড়িবার সময় ঠিক নদীমুখো হইয়া পড়ে। তখন তাহাকে কাটিয়া-কুটিয়া অল্প পরিশ্রমেই জলে ভাসাইয়া লওয়া যায়, কিন্তু গাছগুলি যদি জল হইতে দূরে থাকে অথবা কাছের গাছগুলি যদি সব ফুরাইয়া যায় তাহা হইলে উপায় কি ? তাহা হইলে বীভারেরা দস্তুরমতো খাল কাটিয়া সেই গাছ আনিবার সুবিধা করিয়া লয়। তাহারা নদীর কিনারা হইতে গাছের গোড়া পর্যন্ত দু-হাত চওড়া ও দু হাত গভীর একটি খাল কাটিয়া যায়। তারপর সেই খালে যখন নদীর জল আসিয়া পড়ে, তখন গাছের টুকরাগুলি তাহাতে ভাসাইয়া ঠেলিয়া লইতে আর কোনোই মুশকিল হয় না।

এমন যে বুদ্ধিমান নিরীহ জন্তু, মানুষে তাহার উপরেও অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। দুর্ভাগ্য ক্রমে, বীভারের গায়ের চামড়াটি বড়ই সুন্দর ও মোলায়েম—সৌখিন লোকের লোভ হইবার মতো জিনিস। সুতরাং এই জন্তুকে মারিয়া তাহার চামড়া বিক্রয় করিলে বেশ দু'পয়সা লাভ করা যায়। এই চামড়ার লোভে বিস্তর শিকারী আজ প্রায় দেড়শ বৎসর ধরিয়া নানা দেশে ইহাদের মারিয়া উজাড় করিয়া ফিরিতেছে। মানুষের শখের জন্য কত লক্ষ লক্ষ বীভার যে প্রাণ দিয়াছে তাহার আর সংখ্যা হয় না। এখনও যে ইহারা পৃথিবী হইতে লোপ পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

গ্লাটন

বীভারের কথা বলিয়াছি কিন্তু বুদ্ধিমান জীবের কথা বলিতে গেলে আর একটি জন্তুর কথা বলিতে হয়, তাহার নাম গ্লাটন। চুরি-বিদ্যায় ফাঁকি-বিদ্যায়, খাওয়া-বিদ্যায় এবং নানারকম ধূর্ত-বিদ্যায় ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। শীতের দেশে যাহারা নানারকম দামী চামড়া সংগ্রহের জন্য বীভার প্রভৃতি জন্তু মারিয়া ফেরে তাহারা এই গ্লাটনকে যেমন ভয় করে, এমন আর কাহাকেও নয়। এই গ্লাটন যেখানে দেখা দেয় সেখানে শিকারীর ব্যবসা মাটি। কত কৌশলে কত কষ্ট করিয়া শিকারীরা ফাঁদ পাতে আর গ্লাটন আসিয়া ফাঁদে পড়া জন্তুগুলিকে খাইয়া সব ফাঁদ নষ্ট করিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে কখনও ফাঁদে পড়িবে না, কিন্তু ফাঁদ নষ্ট করিতে তাহার মতো ওস্তাদ আর নাই। যখনি দেখা যায় ফাঁদগুলিকে টানিয়া ঘাঁটিয়া সব লণ্ডভণ্ড করা হইয়াছে, তখনি শিকারীরা বুঝিতে পারে গ্লাটন আসিয়াছে। এই গ্লাটনকে না মারা পর্যন্ত শিকারীর আর নিস্তার নাই। সে যতদিন থাকিবে ততদিন ফাঁদের সমস্ত শিকার কেবল তাহারই পেটে যাইবে। ফাঁদকে সে অগ্রাহ্য করে না, কারণ ফাঁদের মর্ম সে ভালো করিয়াই জানে। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফাঁদ বাহির করে আর ফাঁদের সূতা কাটিয়া স্প্রিং সরাইয়া কাঠি নাড়াইয়া তাহাকে একেবারে নষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং শিকারীরা অনেক সময়েই সে-স্থান ছাড়িয়া বহু দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া ফাঁদ পাতিতে বাধ্য হয়। তাহাতেও সকল সময় নিস্তার নাই; কারণ শিকারীর ফাঁদ হইতে শিকার চুরি করিয়া খাইবার সহজ সুযোগটা ইহারা ছাড়িতে চায় না। তাই একবার কোনো শিকারীর সন্ধান পাইলে ইহারা তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না, গোপনে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চেষ্টা করে।

একবার একটা গ্লাটন প্রায় একমাস ধরিয়া এক শিকারীকে এইরকম জ্বালাতন করিয়াছিল। শিকারী প্রতিদিন পশমী নেউল ধরিবার জন্য ঝোপের মধ্যে দশ-বিশটা করিয়া ফাঁদ পাতিয়া রাখিত, আর প্রতি দিনই আসিয়া দেখিত চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ আর ফাঁদগুলি ভাঙা। তাহাতে দু'চারটি শিকার যাহা ধরা গিয়াছিল তাহাদের কিছু কিছু টুকরা মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। নানারকম কায়দা করিয়া নানা-রকম নূতন ফাঁদ বসাইয়াও সেই একইরকম ব্যাপার চলিতে লাগিল। তখন শিকারী নেউল ছাড়িয়া গ্লাটন

ধরিবার ফাঁদ বসাইল। একটা ঝোপের মধ্যে দরজার মতো খানিকটা ফাঁক, তাহার পিছনে একটা কাঠির আগায় মাংস গাঁথা। সেই মাংস খাইতে গেলেই কাঠিতে টান পড়ে আর স্প্রিং ছুটিয়া আপনা হইতেই দরজা আটকাইয়া যায়। কিন্তু গ্লাটন তাহাতে ভুলিবার পাত্র নয়। দরজাটি দেখিয়াই সে আর সে-মুখো হয় নাই—সে ঘুরিয়া ঝোপের পিছন দিক হইতে কাঠ সরাইয়া কাঠিসুদ্ধ মাংসটাকে বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিল। তারপর শিকারী খোলা বরফের উপর এক টুকরা মাংস বসাইয়া তাহার সঙ্গে খানিকটা সুতা দিয়া একটা বন্দুক এমন কৌশলে আটকাইয়া দিল যে মাংসটাকে খাইতে গেলেই সুতায় টান পড়িয়া



বন্দুক ছুটিয়া যায়। বন্দুকটা একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকানো। পরের দিন শিকারী গিয়া দেখে যে মাংসের চারিদিকে গ্লাটনের পায়ের দাগ, কিন্তু সে মাংসটুকু ছোঁয় নাই। শিকারী আরো বেশি মাংস দিয়া ভাবিল, অমন পেটুক জন্তু কি আর মাংসের লোভ সামলাইতে পারে? পরদিন সকালে দেখা গেল মাংসও খাইয়াছে, বন্দুকও ছুটিয়াছে, কিন্তু গ্লাটন মরে নাই। সে গাছের গুঁড়ির আড়ালে থাকিয়া সুতা টানিয়া ছিঁড়িয়াছে। তাহাতে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধহয় সে ভয় পাইয়া পলাইয়াছিল কিন্তু পায়ের দাগ দেখিয়া বোঝা যায় যে, সে পরে আবার আসিয়া মাংসটা খাইয়া গিয়াছে। তখন শিকারীর জেদ চড়িয়া গেল। সে ভাবিল, যেমন করিয়া হউক, এই হতভাগাটাকে মারিতেই হইবে। এই ভাবিয়া সে মাটিতে মাংস রাখিয়া জ্যোৎস্নারাত্রে বন্দুক হাতে করিয়া একটা গাছের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু সে রাত্রে আর গ্লাটনের দেখাই পাওয়া গেল না। শীতের রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া শিকারী যখন তাহার কাঠের তাঁবুতে

ফিরিয়া আসিল, তখন সে দেখিল যে, তাঁবুর জিনিসপত্র সব উলটপালট, আর অনেক জিনিস চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁবুর বাহিরে কেবল গ্লাটনের পায়ের দাগ। তারপর অনেক কষ্টে চারিদিকে নানা স্থান হইতে চোরাই জিনিস সব সংগ্রহ করিয়া শিকারী সেই যে সেখান হইতে একেবারে সরিয়া পড়িল, ত্রিশ মাইল পথ পার না হইয়া আর নূতন ফাঁদ পাতিল না।

গ্লাটনের নামে এই দুটি মস্ত অপবাদ—সে চোর এবং পেটুক। সে যে পেটুক তাহার আর অন্য প্রমাণ দরকার নাই—এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে ইংরাজিতে 'গ্লাটন' (Glutton) কথাটার অর্থই হয় পেটুক। দেখিতে কতকটা শেয়ালের মতো, চেহারাটাও তাহার চাইতে বড় নয়; কিন্তু সে যে পরিমাণ আহার করে তাহাতে একটা বাঘেরও বেশ পরিতোষ করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়া চলে। আর চোর হওয়ার কথাটা তো আগেই শুনিয়াছ। সে যে কিরকম চোর তাহা চুরির নমুনাতেই বোঝা যায়। যে জিনিস সে খায় না, যাহার ব্যবহার সে জানে না এবং যে জিনিসে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এমন সব জিনিসও সে সুযোগ পাইলেই সরাইয়া ফেলে। ছাতা জুতা টুথব্রাশ কাগজ কলম হইতে আরম্ভ করিয়া হাঁড়িকুড়ি বা উনানের লোহার শিক পর্যন্ত চুরি করিতে সে ইতস্তত করে না।

গ্লাটনের আর একটি অভ্যাস আছে, সেও কম অদ্ভুত নয়। হঠাৎ মানুষ বা অপরিচিত জন্তুকে দেখিলে সে খাড়া হইয়া দুই পায়ের উপর ভর দিয়া বসে এবং সামনের পা দু'খানা চোখের উপরে এমন-ভাবে উঠাইয়া ধরে যে দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন ভালো করিয়া পরখ করিবার জন্য চোখটাকে আড়াল দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরকম বুদ্ধি আর এইসব অদ্ভুত রকম-সকম দেখিয়া সে দেশের লোকে অনেক সময়ে ভয় পায়—তাহারা বলে এই জন্তুটার চালচলন কেমন ভূতের কাণ্ড বলিয়া মনে হয়।

নরওয়ে দেশে ভালুক বা নেকড়ে বাঘ মারিতে পারিলে যে পুরস্কার পাওয়া যায়, গ্লাটন মারিলেও ঠিক সেই পুরস্কার। ইহাতে বুঝিতে পার যে, এই ছোট জন্তুটির অত্যাচারকে মানুষে কিরকম ভয় করে।

ঘোড়ার জন্মে

তোমরা সকলেই জান যে, এমন এক সময় ছিল যখন এই পৃথিবীতে মানুষ ছিল না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তু গাছপালা কোথাও কিছু ছিল না। তখন এই পৃথিবী তপ্ত কড়ার মতো গরম ছিল—বৃষ্টির জল তাহার উপর পড়িবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিত। তারপর যখন পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহাতে অল্প অল্প গাছপালা জীবজন্তু দেখা দিতে লাগিল।

জীবজন্তু আসিবার অনেক হাজার হাজার বৎসর পরেও মানুষের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় নাই। আজকাল আমরা যে-সকল জানোয়ার সচরাচর দেখিতে পাই—এগুলিও সব 'আধুনিক' কালের—অর্থাৎ সেই অতি প্রাচীনকালের জানোয়ারেরা সকলেই এখন লোপ পাইয়াছে। সকলে কিন্তু একেবারে

লোপ পায় নাই ; যদি পাইত তবে এখন পৃথিবীতে এসব জীবজন্তুর কিছুই দেখিতাম না। এখনকার এইসকল জানোয়ারগুলি সকলেই প্রাচীনকালের কোনো-না-কোনো জানোয়ারের বংশধর। এই যে অতি সভ্য অতি বুদ্ধিমান মানুষ, ইহার বংশের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই তবে এমন জায়গায় গিয়া পড়িব যেখানে মানুষকে আর মানুষ বলিয়া চিনিবার জো থাকিবে না।

এমনিভাবে প্রত্যেক জানোয়ারের ইতিহাস যদি খুঁজিতে যাই—প্রাচীনকালের পাহাড়ের স্তরে তাহাদের যে-সকল কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়, সে-সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি—তবে প্রত্যেকের বেলায় এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে-সকল জানোয়ার ছিল, তাহারা সকলেই তো আর আপন আপন কঙ্কালচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই—যে-সকল কঙ্কাল পাহাড়ের মধ্যে আজও জমিয়া আছে, তাহারও অতি অল্পই মানুষের চোখে পড়িয়াছে। সেইজন্য সকল জন্তুর পূর্বপুরুষের হিসাব এখনও ভালো করিয়া পাওয়া যায় নাই। দুটা একটা যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতেই কতকটা স্পষ্ট দেখা যায়, কতকটা অনুমান করিয়া বুঝিতে হয়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সেই যুগের এক-একটা জানোয়ার এই যুগের কুকুর বেড়াল গরু হরিণে পরিণত হইয়াছে। পুরাতন কঙ্কাল হইতে যত জানোয়ার-বংশের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার ইতিহাস আমরা যেমন জানি এমন আর কাহারও নহে। আমেরিকার 'রকি' পাহাড়ে অনেক জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন পাওয়া যায়। কয়েকজন পণ্ডিত চৌদ্দ বৎসর ক্রমাগত সন্ধান করিয়া সেখানে নানা প্রাচীন যুগের প্রায় আটশত ঘোড়ার কঙ্কাল বাহির করিয়াছেন। 'ঘোড়া' বলিলাম বটে কিন্তু তাহার অনেকগুলিকেই সহজে ঘোড়া বলিয়া চিনিবার জো নাই।

সবচাইতে পুরাতন যেটি, তাহার নাম 'ইয়োহিপ্পাস (Eohippus) বা 'আদি অশ্ব'। দেখিতে একটি ছোট ছাগলছানার চাইতে বড় হইবে না—পায়ে তার চারটি করিয়া আঙুল বা খুর—আর একটা পঞ্চম আঙুলের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। দেখিলে কে বলিবে যে, এই জন্তুই ঘোড়ার পূর্বপুরুষ ? কিন্তু সবগুলি কঙ্কাল মিলাইয়া যুগ হিসাবে পর পর সাজাইয়া দেখ, ঘোড়ার জন্মের ইতিহাস যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছাগলছানার মতো ছোট জন্তুটি কেমন করিয়া যুগের পর যুগ ক্রমে বড় হইল, কেমন করিয়া ক্রমে তাহার চেহারা অল্পে অল্পে বদলাইয়া আসিল, কেমন করিয়া নিত্য নূতন অবস্থার মধ্যে তাহার শরীরের নিত্য নূতন পরিবর্তন ঘটিতে ঘটিতে সেই যুগের 'আদি অশ্ব' এই যুগের আধুনিক ঘোড়ায় পরিণত হইল, তাহার জীবন্ত চিত্র পাথরের গায়ে কঙ্কালের লেখায় লিখিত রহিয়াছে।

বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের গড়ন মজবুত হইয়া আসিয়াছে—তাহার সমস্ত শরীরটা দ্রুত দৌড়িবার উপযোগী হইয়াছে। যে দৌড়াদৌড়ি করে, যাহাকে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। সুতরাং দেহের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণ খাদ্য চিবাইবার উপযোগী দাঁত তাহার থাকা চাই। তাহার চোয়ালের হাড়ও ক্রমে সেইরূপ মজবুত হওয়া দরকার। এই সকল কঙ্কালের দাঁত ও মাথার হাড় পরীক্ষা করিলেও ঠিক এই কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

কিন্তু সকলের চাইতে চমৎকার তাহার খুরের ইতিহাস। আদিকালের সেই পাঁচটি আঙুল কেমন



বুনো ঘোড়া নেকড়ের সঙ্গে লড়াই করছে।

করিয়া এই যুগে একটা ভোঁতা খুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ইতিহাস অতি সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে এই সকল কঙ্কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আদি অশ্বের সময়েই পাঁচ আঙুলের একটি প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছিল; তারপর ক্রমে আর একটি আঙুলও লোপ পাইল—বাকী রহিল মাত্র তিনটি। সংখ্যায় কমিল বটে, কিন্তু মাঝের আঙুলটি ক্রমে মোটা হইয়া লুপ্ত আঙুলগুলির অভাব দূর করিয়াছে। পাশের আঙুল দুটো ক্রমেই ছোট হইয়া অনেকদিন পর্যন্ত হাড়ের টুকরার মতো পায়ের দু'পাশে লাগিয়া ছিল। তারপর এখনকার ঘোড়ার পায়ে ওই একটা আঙুলই সবটুকু স্থান দখল করিয়াছে—তাহাকে আর এখন আঙুল বলা চলে না।

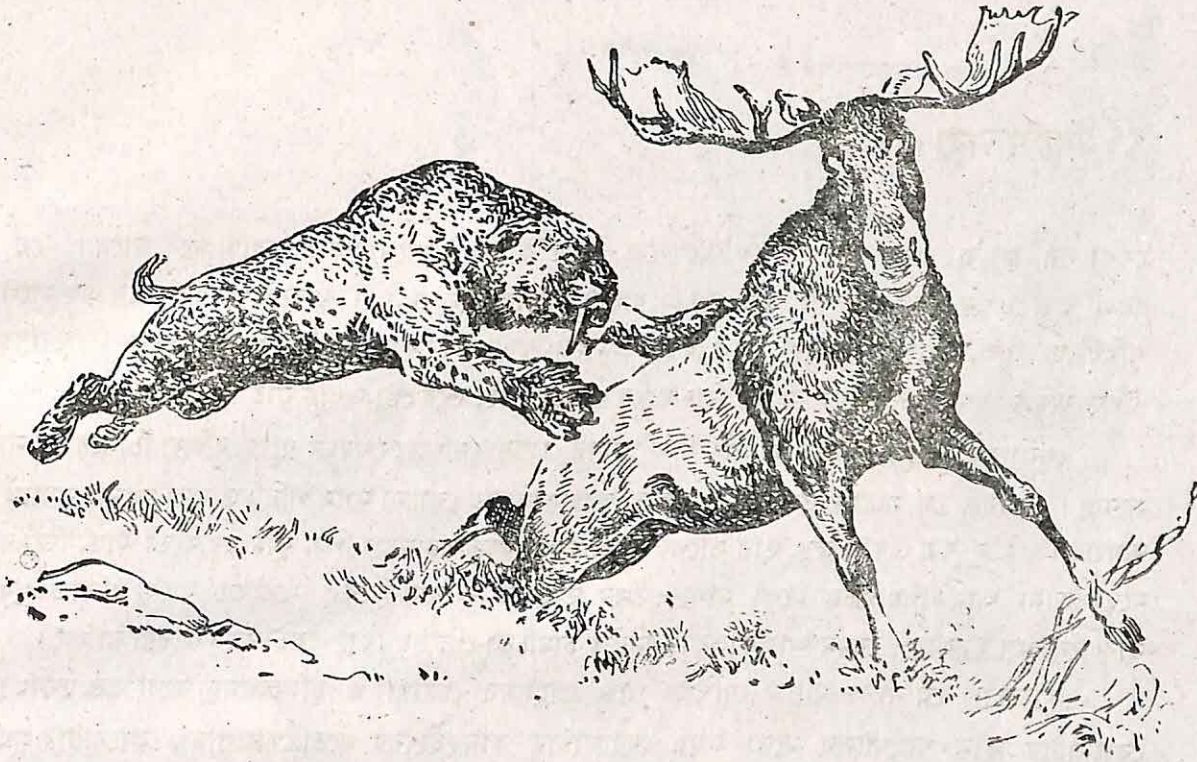
কোন সময় হইতে মানুষ ঘোড়াকে বশ মানিতে শিখাইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না। অতি প্রাচীন যুগের আদিম মানুষ যাহারা বনে-জঙ্গলে গুহা-গহ্বরে বাস করিত, তাহাদের শেষ চিহ্নের আশেপাশে লোমশ গণ্ডার, অতিকায় হস্তী, খড়্গদন্ত ব্যাঘ্র ও গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন আজও পাওয়া যায়। ঘোড়ার ঐ তিন আঙুলওয়ালা পূর্বপুরুষদের কেহ যে মানুষের কাজে লাগে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে!

সেকালের বাঘ

সেকালে এমন সব জন্তু ছিল যা আজকাল আর দেখা যায় না—একথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সেকালের চার দাঁতওয়ালা হাতি, ত্রিশ হাত লম্বা কুমির বা হাঁসুলি-পরা তিন শিঙা গণ্ডার, এর কোনোটাই আজকাল পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে গুহা-গহ্বরে পাহাড়ের গায়ে বা বরফের নীচে তাদের কঙ্কালের কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়—তা থেকেই পণ্ডিত লোকে বুঝতে পারেন যে, এক সময়ে এই-এই রকম জানোয়ার পৃথিবীতে ছিল। যাঁরা এই সকল জিনিসের চর্চা করেন, তাঁরা সামান্য এক টুকরা দাঁত দেখে বলতে পারেন—এটা কি রকম জন্তুর দাঁত, সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, ইত্যাদি।



এবার যে জানোয়ারের কথা বলছি ইংরাজিতে তাকে বলে Sabre-toothed Tiger (অর্থাৎ খড়্গদন্ত বাঘ)। এর কঙ্কাল



ইউরোপে, আমেরিকায়, আমাদের দেশে এবং আরও নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এই খড়্গের মতো দাঁত দুটিতে তার কি কাজ হ'তো, সেকথা বলা শক্ত। অত লম্বা দাঁত দিয়ে কামড়াবার সুবিধা হয় না; তাছাড়া, এই বাঘের চোয়ালের হাড় আজকালকার বাঘের মতো মজবুত নয়, সুতরাং তার কামড়ের জোরও কম ছিল। দাঁত দুটি প্রায় ছয় ইঞ্চি করে লম্বা, তার গায়ে ছুরির মতো ধার—হয়ত তা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শিকারের মাংস ছাড়াবার সুবিধা হ'তো। যে জন্তু যে রকম স্থানে যে রকম অবস্থায় বাস করে সে অনুসারে তার চেহারা ও গায়ের রং কিছু-না-কিছু বদলিয়ে আসে। বাঘের গায়ে যে কালো-কালো দাগ দেখতে পাও তাতেই বুঝতে পারা যায় যে, ঝোপ-জঙ্গলে চলাফিরা তার অভ্যাস আছে, সেখানে বড় বড় ঘাসের ঝোপে যখন বাঘমশাই লুকিয়ে থাকেন তখন সেই খাড়া ঘাসের আলো-ছায়ার সঙ্গে বাঘের হলদে-কালোর ডোরাগুলি এমনিভাবে মিশিয়ে যায় যে, হঠাৎ দেখলে বুঝবার জো নেই যে, ওখানে ঝোপ ছাড়া আর কিছু আছে। কিন্তু যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় আমাদের খড়্গদন্ত মহাশয় সিংহের মতো খোলা জায়গাতেই সাধারণত বাস করতেন—সুতরাং তাঁর গায়ে একালের বাঘের মতো দাগ না থাকাই সম্ভব বোধ হয়।

একালের বাঘের চাইতে খড়্গদন্তের মুখখানা অনেকটা লম্বাটে গোছের ছিল। তার লেজটিও সাধারণত একটু বেঁটে হ'তো। শরীরের গড়নটা মোটের উপর আজকালকার বাঘেরই মতো, কিন্তু একটু ভারী গোছের—বিশেষত সামনের পায়ের দিকটা। সুতরাং তার পক্ষে খুব দৌড়োনো বা লাফানো বা চট্‌পট্ হাত পা নাড়া বড় সহজ ছিল না। নানান যুগের নানারকম পাথরে এই বাঘের কঙ্কাল পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, এরা বহুকাল ধরে পৃথিবীতে নানা দেশে দৌরাত্ম্য করে তারপর কেন জানি না একেবারে লোপ পেয়েছে।

সেকালের বাদুড়

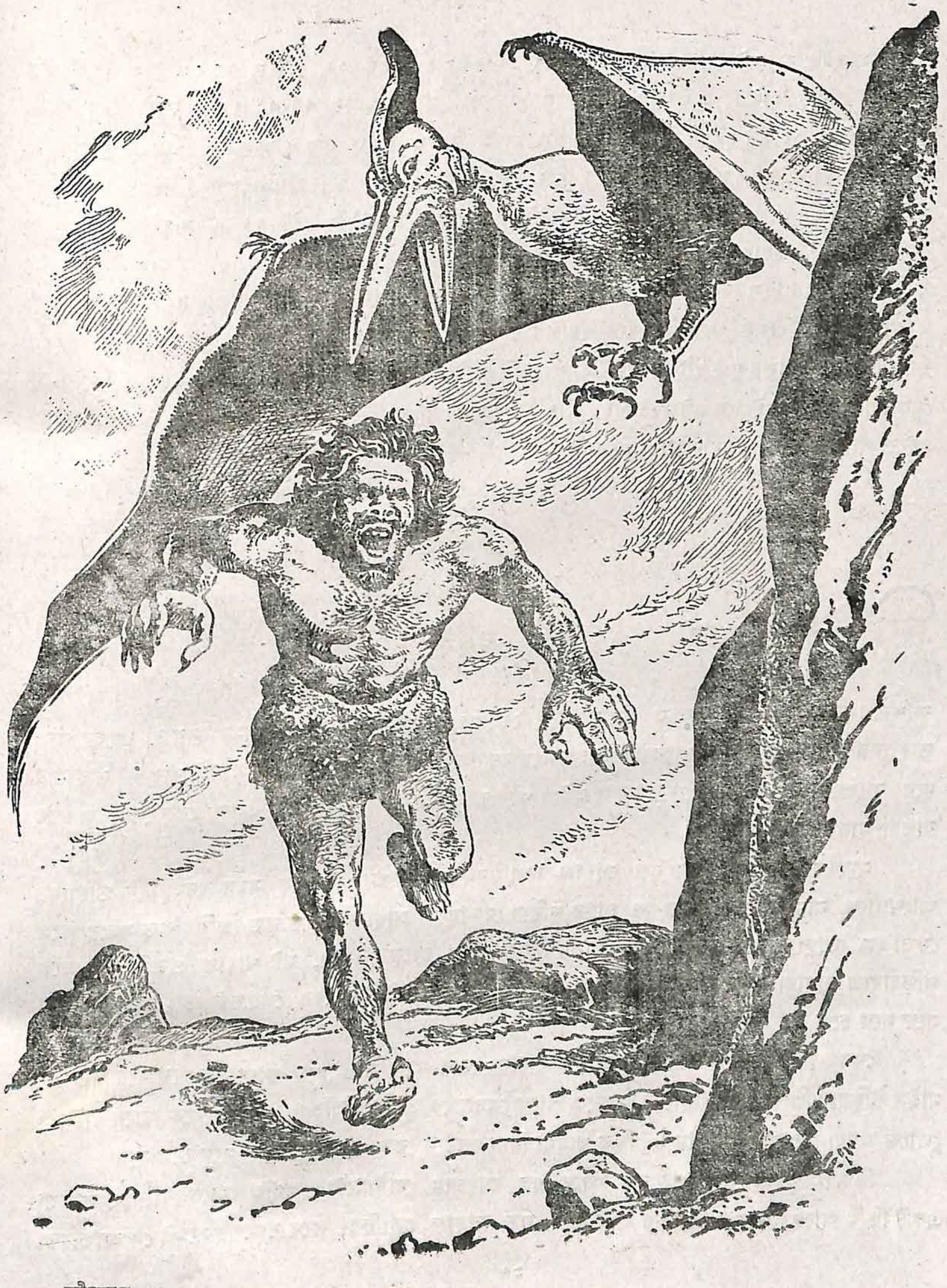
'সেকালের জন্তু'র কথা বলিলেই একটা কোনো কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের চেহারা মনে আসে। যে সকল জন্তু এখন দেখিতে পাই না, অথচ যাহার কঙ্কালচিহ্ন দেখিয়া বুঝিতে পারি যে, সে এককালে পৃথিবীতে ছিল, তাহার চেহারা ও চালচলন সম্বন্ধে স্বভাবতই কেমন একটা কৌতূহল জাগে। তাহার উপড় যদি তাহার মধ্যে কোনো অদ্ভুত বিশেষত্বের পরিচয় পাই, তবে তো কথাই নাই।

সেকালের 'বাদুর' লিখিলাম বটে, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিলে সবসময় বাদুড় বলিয়া চিনিবে কি না সন্দেহ। কারণ, সে সময়ের এক-একটা জন্তুকে আজকালকার কোনো নামে পরিচিত করা অনেক সময়েই অসম্ভব। মনে কর একটা জন্তু, তার সাপের মতো গলা, কচ্ছপের মতো পিঠ, কুমিরের মতো দাঁত, তিমির মতো ডানা আর গিরগিটির মতো মাথা—তখন তাহাকে কি নাম দিবে? সেইজন্য বাদুড় বলিতে খুব সাবধানে বলা দরকার—যেমন আজকালকার নিরীহ চামচিকা গোছের কিছু-একটা মনে করিয়া না বস।

আজকাল যে-সকল বাদুড় দেখিতে পাও তাহাদের চেহারা ও চালচলনের মধ্যে কত তফাৎ! কোনোটার কান খরগোসের মতো লম্বা, কোনোটার কান ইঁদুরের মতো গোলপানা, কোনোটার মুখ শেয়ালের মতো, কোনোটার মুখ ভেংচিকাটা সঙের মতো, কারও নাক পদ্মফুলের মতো ছড়ানো, কারও নাক নাই বলিলেও হয়। কিন্তু সেকালের যে জানোয়ারগুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরও অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক-একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখি আর কুমির মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে। এগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় টেরোড্যাক্টাইল (Pterodactyl) অর্থাৎ যাহার আঙুলে পাখা।

পাহাড়ের গায়ে যেসব পাথরের স্তর থাকে তাহারা চিরকালই পাথর ছিল না। অনেক পাথর এক সময় মাটির মতন নরম ছিল। সেই নরম মাটিতে জানোয়ারের কঙ্কাল জমিয়া অনেক সময়ে একেবারে পাথর হইয়া থাকে—এইরকম পাথরকে এক কথায় জীবশিলা বলা যাইতে পারে। এক সময় ছিল যখন পৃথিবীতে পাখি বা বাদুড় কিছু দেখা যায় নাই—তখন সরীসৃপের যুগ ছিল। অদ্ভুত কুমির বা গোসাপ তখন ভয়ংকর মূর্তি ধরিয়া পৃথিবীতে দৌরাত্ম্য করিত। সেই অতি প্রাচীন যুগের পাথরে এ সকল বাদুড়ের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না—যা কিছু পাওয়া যায় সবই আরও আধুনিক যুগের। 'আধুনিক' বলাতে মনে করিও না যে, মাত্র কয়েক শত বা সহস্র বৎসরের কথা বলিতেছি—সে 'আধুনিক' যুগ কয় লক্ষ বৎসর আগেকার তাহা আমি জানি না।

যত রকম 'বাদুড়' পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সব চাইতে পুরাতনটি যে মাংসাশী ছিলেন, ইঁহার দাঁতের মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার নাম রাখা হইয়াছে, 'ডাইমর্ফোডন' (Dimorphodon) অর্থাৎ দ্বিমূর্তিদন্তী।



সবগুলি বাদুড়ই যে প্রকাণ্ড বড় হইত তাহা নহে, কিন্তু সব চাইতে বড়গুলি যে খুবই বড় তাহাতে সন্দেহ নাই। দক্ষিণ আমেরিকায় যে-সকল বাদুড়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে তাহার এক-একটি ডানা মেলিলে ২৫ ফুট চওড়া হয়। ইহাদের মাথার উপরে অদ্ভুত এক প্রকাণ্ড শিং ছিল। এই শিংটা তাহার কি কাজে লাগিত তাহা জানি না, কিন্তু ইহাতে তাহার বিদ্‌ঘুটে চেহারার কোনো উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এত বড় জন্তুটা উড়িলে পরে তাহার ডানা ঝাপটাইবার শব্দ নিশ্চয়ই বহুদূর হইতে শোনা যাইত। ইহারা কোনোরূপ শব্দ করিত কি না বলিতে পারি না কিন্তু আওয়াজ করিলে সেটা খুব সুমিষ্ট হইত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহাদের মুখে নাকি দাঁত থাকিত না কিন্তু তাহাতেও আশ্বস্ত হইবার বিশেষ কোনো কারণ দেখি না, কারণ ইহার যে ঠোঁট ছিল তাহাতে সাংঘাতিক ধার! সুতরাং তাহার ঠোকর দু-একটা খাইলে আর বেশি খাইবার দরকার হইত না। মোট কথা, এ জন্তুটা যে সেকালেই লোপ পাইয়াছে এটা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে। তা নহিলে কিরকম অবস্থা হইতে পারিত, তাহা অনুমান করিতে পার।

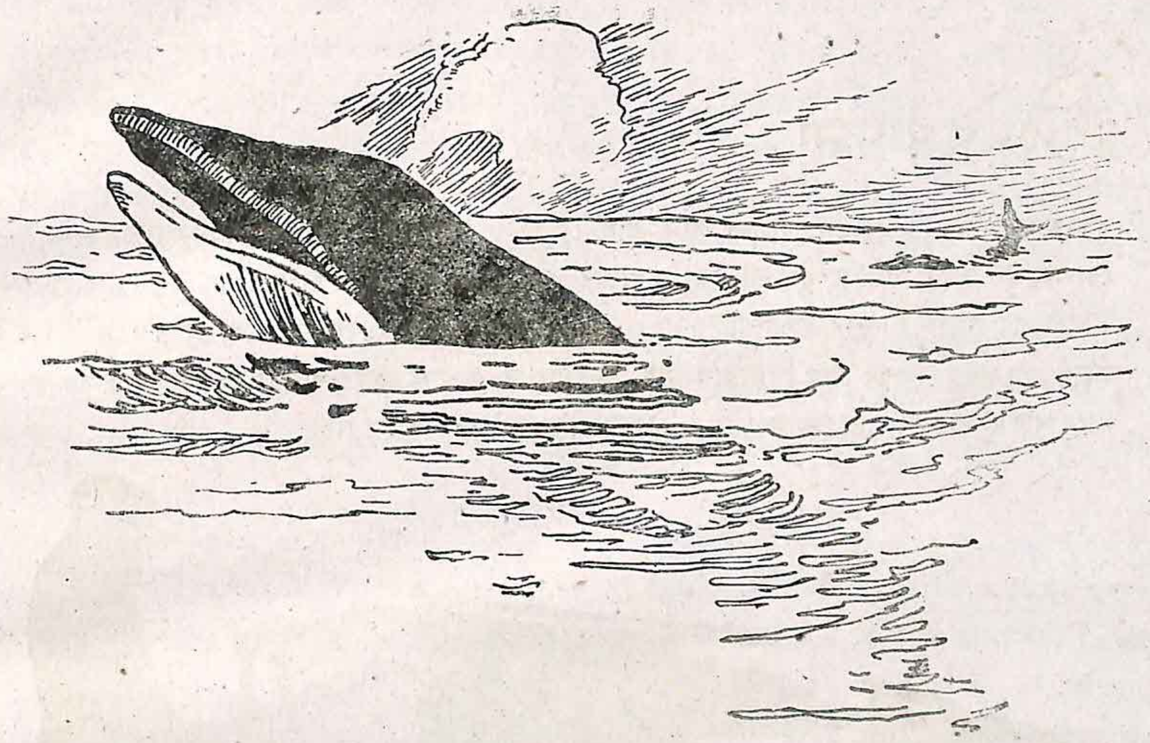
তিমির খেয়াল

রুশিয়ার দুরন্ত শীতে মানুষ যখন নির্জন পথে চলাফিরা করে তখন অনেক সময় নেকড়ে বাঘের পাল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহারা যে বন্ধুভাবে চলে না, তা অবশ্য বুঝিতেই পার। তাহাদের দূরে রাখিবার জন্য মানুষ অস্ত্রশস্ত্র বন্দুক লইয়া পথে বাহির হয় এবং পারতপক্ষে একলা কেহ সে সকল পথে যাওয়া-আসা করিতে চায় না।

সমুদ্রের পথে যখন বড় বড় জাহাজ চলাফিরা করে তখনও অনেক সময় দেখা যায়, তাহাদের আশেপাশে নানা জাতীয় মাছ ও হাঙর ঘুরিয়া বেড়ায়। জাহাজ হইতে কত জিনিস কত সময়ে জলে ফেলা হয়, তাহার মধ্যে তরকারির খোসা, মাংসের বা হাড়ের টুকরা, নষ্ট খাবার প্রভৃতি কিছু জলে পড়িবামাত্র তাহারা কাড়াকাড়ি করিয়া সব খাইয়া ফেলে। ঐ খাবারের লোভেই তাহারা জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে।

কেবল মাছ কেন, কত পাখিকেও অনেক সময় দেখা যায় মাঝসমুদ্রে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে শত শত মাইল উড়িয়া চলিতেছে। তাহাদের অনেকে আসে কেবল কৌতূহল মিটাইবার জন্য, অনেকে আসে খাইবার লোভে অথবা বিশ্রামের আশায়। কিন্তু খামখা বিনা কারণে কেহ জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে চলে না।

কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের উপকূলের কাছে এক জায়গায় ছোটখাটো—অর্থাৎ মোটে বারো হাত লম্বা একটি তিমি আছে, তাহার বাড়ির কাছ দিয়া যত জাহাজ চলাফিরা করে সকলের সঙ্গেই সে আত্মীয়তা

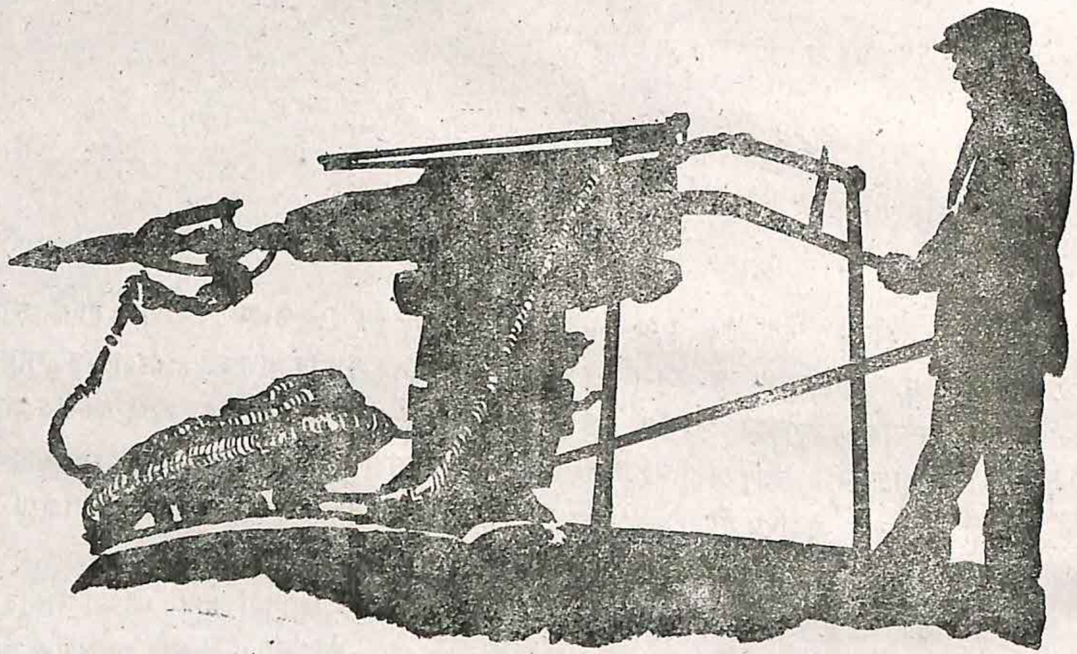


করিতে আসে। এইরকম সে কত বছর করিয়া আসিতেছে, কেন করে তাহা কেহ জানে না। জাহাজ হইতে যে-সকল খাবার জিনিস জলে ফেলা হয় তাহার কোনোটাই তাহার খাদ্য নয়—জাহাজের লোকদের দ্বারা তাহার কোনোরকম উপকার হওয়াও সম্ভব নয়—অথচ সে প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে একবার খানিক দেখা না করিয়া ছাড়ে না। শুধু দেখা নয়, আধ ঘণ্টাখানেক অনায়াসে জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে চলে যেন সে জাহাজকে পথ দেখাইয়া লইতে চায়। মাঝে মাঝে জাহাজের গায়ে গা ঘষিয়া আর ঢেউয়ের ফেনায় ডিগবাজি খাইয়া সে নানারকমে মনের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

সেখানকার নাবিকেরা সকলেই এই অদ্ভুত তিমির কথা জানে। তাহারা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছে 'পেলোরাস্ জ্যাক্'—'পেলোরাস্' ওই জায়গাটার নাম। এই তিমির সম্বন্ধে সে দেশে অনেক রকম অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। একবার নাকি কোন জাহাজ হইতে কে একজন লোক 'জ্যাক'কে গুলি করিয়াছিল—তারপর অনেকদিন তাহাকে দেখা যায় নাই। আবার সে ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সেই জাহাজটার কাছে আর কখনও আসে না। নিউজিল্যাণ্ড মাওরিদের দেশ—তাহারা এই তিমিকে দেবতার মতো ভক্তি করে। এমনকি সে দেশের গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত ইস্তাহার দিয়া সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, কেহ যেন 'জ্যাকে'র কোনোরকম অনিষ্ট না করে।

তিমির ব্যবসা

কথায় বলে 'ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়'। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানরা যখন প্যারিস শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন প্যারিসের লোকেরা খাবারের অভাবে ঘোড়ার মাংস খাইতে বাধ্য হয়। তাহার আগে ইউরোপের লোকে ঘোড়ার মাংস খাইত না। কিন্তু এই সময় হইতে দেখা গেল যে, ঘোড়ার মাংসটা খাইতে লাগে মন্দ নয়। এখন শুধু প্যারিসে নয়, ইউরোপের অন্যান্য বিস্তর শহরেও লোক সখ করিয়া ঘোড়ার মাংস খাইয়া থাকে। তাহার জন্য আর 'ঠেলায় পড়িবার' দরকার হয় না।



এখন যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতেও খাদ্য সমস্যা একটা মস্ত সমস্যা। চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোক এক-এক দিকে যুদ্ধ করিতেছে, কেবল তাহাদের খাওয়া যোগাইলেই নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই —সমস্ত দেশের লোক কি খাইবে, কি পরিবে, তাহার ভাবনাও প্রত্যেক দেশের শাসনকর্তাদের ভাবিতে হয়। ইউরোপের খাওয়া যোগাইবার ভার এখন অনেক পরিমাণে আমেরিকার উপরে পড়িয়াছে। ইউরোপের জাতিরা মাংসখোর জাতি, প্রতি বৎসর তাহারা লক্ষ-লক্ষ মণ মাংস খাইয়া শেষ করে। এত মাংস চালান দেওয়া কি কম কথা! বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে যে সব খাবার জিনিস চালান আসে জার্মান জলদস্যু ডুবুরি জাহাজ সেইগুলিকে নষ্ট করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাতেও কত খাবার সমুদ্রে ডুবিয়া নষ্ট হয়।

আমেরিকার বুদ্ধিমান লোকে এই সমস্যার একটা মীমাংসা করিয়াছেন বড় চমৎকার। তাঁহারা তিমির মাংস প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহার মধ্যেই আমেরিকার নানা স্থানে এই মাংসের ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে—তিমি ধরিয়া তাহার মাংস চালান দিবার জন্য বড় বড় কারখানা বসিয়াছে। তাহার একটিমাত্র কারখানা হইতে বছরে ৯০০০ মণ মাংস টিনে ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। নূতন কোনো খাওয়ার অভ্যাস মানুষ সহজে ধরিতে চায় না, সেইজন্য আমেরিকার একদল লোক বক্তৃতা করিয়া, কাগজপত্রে লিখিয়া, বায়োস্কোপে ছবি দেখাইয়া এ বিষয়ে মানুষের মনের বিরোধ ভাঙিতেছেন। আমেরিকার কোনো কোনো শহরে প্রকাশ্য বাজারে দশ আনা সেরে তিমির মাংস বিক্রয় হইতেছে।

গরু ঘোড়া শূকর কিছুতেই যাহাদের আপত্তি নাই তাহারা যে তিমি খাইতে বেশিদিন আপত্তি করিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা ইহার মধ্যেই ও জিনিষটা খাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন—চমৎকার মাংস! ইউরোপের বাজারে ইহাকে গো-মাংস বলিয়া চালাইলেও কেহ কোনো তফাৎ বুঝিবে কি না সন্দেহ।

সবরকম তিমির মাংস খাইতে ভাল নয়। যেগুলি বিশেষভাবে খাওয়ার উপযোগী সেগুলি সাধারণ ছোটখাটো তিমি—অর্থাৎ মোটে ২০/২৫ হাত লম্বা। মোম তিমি বা sperm whale লম্বায় খুব বড় হয়—এক একটা ৬০ হাত পর্যন্ত দেখা গিয়াছে। সব চাইতে বড় যে তিমি সেগুলি থাকে একেবারে উত্তরে, মেরু সমুদ্রের কাছে—তাহারা লম্বায় মোম তিমির সমান, কিন্তু অনেকখানি চওড়া ও মোটা এবং ওজনেও প্রায় দেড়া। এক একটি বড় তিমির ওজন চার হাজার মণেরও বেশি হয়—অর্থাৎ ত্রিশ চল্লিশটা বড় বড় হাতির সমান। এই সমস্ত অতিকায় তিমি আগে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দেখা যাইত, কিন্তু মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ ক্রমে প্রায় উজাড় হইয়া আসিতেছে।

তিমি নানা রকমের হয়—তাহাদের মোটের উপর দুই দলে ভাগ করা যায়। এক দলের দাঁত নাই, আর এক দলের দাঁত আছে। যেগুলোর দাঁত নাই তাহাদের মুখের ভিতরে প্রকাণ্ড চিরুনির ঝালরের মতো একটা জিনিস থাকে, তাহাকে বলে কাচকড়া বা whale bone। এই জিনিসটা মানুষের অনেক সৌখিন কাজে লাগে এবং বাজারে বিক্রয় করিলে বেশ দামও পাওয়া যায়। তাছাড়া এক-একটা তিমির গায়ে যে পরিমাণ তেল বা চর্বি থাকে তাহার দামও বড় সামান্য নয়। যে মোম তিমির কথা আগে বলিয়াছি তাহার মুখে কাচকড়া নাই কিন্তু তাহার মাথার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা ভরা মোম থাকে। এই মোমের চমৎকার বাতি হয় এবং নানা রকম মলম প্রভৃতি হয়। এই মোম চর্বি ও কাচকড়ার জন্য মানুষে সমুদ্রের নানা স্থানে বড় বড় তিমিগুলিকে নিঃশেষ করিয়া এখন ছোটখাটো তিমির পিছনে লাগিয়াছে।

যেসব ছোটখাটো তিমির কথা বলা হইল, তাহাদের এক একটাকে মারিলে প্রায় তিন-চারশত মণ মাংস পাওয়া যায়। আজকাল তিমির ব্যবসা অনেক কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু গত দুই বৎসরে কেবল উত্তর আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলেই বারো শতের বেশি তিমি মারা হইয়াছে। এখন এ ব্যবসায়ে আরও লাভ হইবার কথা, কারণ এখন হইতে তিমির হাড় মাংস চর্বি চামড়া সমস্তই কাজে লাগানো চলিবে। এতকাল চর্বি ও কাচকড়া বাহির করিবার পর অত বড় প্রকাণ্ড দেহটাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহাতে কেবল হাজার হাজার জলজন্তুর খোরাক জুটিত। কিন্তু এখন সেই মাংসে মানুষের উদরপূর্তি

হইবে। এইরূপ একটা তিমিকে মারিলে স্বচ্ছন্দে বিশ-ত্রিশ হাজার লোকের ভোজের আয়োজন হইতে পারে। তারপর কঙ্কালটুকুও ফেলিবার জিনিস নয়—তাহাকে পোড়াইয়া চমৎকার জমির সার ও নানা রকম ঔষধ তৈয়ারি হইবে। চামড়াটায় চর্বি ভরা বলিয়া তাহাকে অনেকদিন পর্যন্ত কাজে লাগাইবার সুবিধা হয় নাই—এখন তিমির ছাল কলে পিষিয়া চর্বি বাহির করিয়া চমৎকার মজবুৎ চামড়া তৈয়ারি হইতেছে। সুতরাং মানুষের মতো এ-হেন অত্যাচারী রাক্ষসের হাত এড়াইবার জন্য তিমি গভীর সমুদ্রে পলাইয়া হয়ত এখনও বাঁচিতে পারে—না হইলে তাহার বংশ লোপ হওয়ার খুবই আশঙ্কা আছে।

এত বড় প্রাণীটা, কিন্তু মোটের উপর তাহার স্বভাবটি বেশ নিরীহ বলিতে হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় তিমির দল সমুদ্রের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছে ; তাহাদের একটাকে মারিলে বাকীগুলা ব্যস্ত হইয়া চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে। তখন একটার পর একটাকে বল্লমে গাঁথিয়া দলকে দল মারিয়া ফেলা খুবই সহজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সব তিমি সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। কোনো কোনো দাঁতওয়ালা তিমি আছে, তাহাদের মেজাজটা দস্তুরমতো বদরাগী। এ বিষয়ে মোম তিমির দুর্নাম সব চাইতে বেশি। মাঝে মাঝে এক-একটা দলছাড়া মোম তিমি দেখা যায়, তাহাদের ঘাঁটাইবার দরকার হয় না—জাহাজ দেখিলেই তাহারা তাড়া করিয়া যায়। তিমির তাড়া যে কেমন তাড়া, সে তাড়া যে খাইয়াছে সে-ই জানে। কখনও সে ঢুঁ মারে, কখনও সে হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসে, কখনও তাহার গায়ের ধাক্কায় জাহাজ চুরমার হয়—অথবা লেজের ঝাপটায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত করে, এই ভয়ে মাঝি-মাল্লা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। আর যাহাদের 'নিরীহ তিমি' বলি, তাহারাও যখন মরিবার সময় সমুদ্র তোলপাড় করিয়া ছট্‌ফট্ করে তখন সেও একটা কম সাংঘাতিক ব্যাপার হয় না।

তিমির খাওয়ার মধ্যেও রকমারি দেখা যায়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারা সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক খাইয়া বেড়ায়। এক-একবার হাঁ করিয়া মাছের ঝাঁকসুদ্ধ সমুদ্রের জল মুখের ভিতর পুরিয়া লয় ; তারপর সেই কাচকড়ার জালের ভিতর দিয়া সেই জল ফুঁকিয়া বাহির করে—মাছগুলো সব এই অদ্ভুত ছাঁকনিতে আটকাইয়া থাকে। ইহাদের গলার ফুটা এত ছোট যে নিতান্ত পুঁটি বাটা ছাড়া কোনো বড় মাছ গেলা ইহাদের সাধ্য নয়। কিন্তু দাঁতাল তিমিরা এরকম খুচরা খাইয়া সন্তুষ্ট হয় না। তারা বড় বড় সমুদ্রের জন্তুকে মারিয়া খায়। মোম তিমিরা এক মাইল গভীর সমুদ্রে ডুব মারিয়া সেখানকার বড় বড় বিদ্‌ঘুটে জন্তুগুলোকে খাইতে ছাড়ে না। একবার একটা তিমির পেটে একটা প্রকাণ্ড অক্টোপাসের কিছু কিছু টুকরা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার এক একটা পা হাতির পায়ের সমান মোটা। সে জন্তুটা যে আট-দশটা হাতির সমান বড় ছিল, তাহাতে আর কোনো সন্দেহ নাই।

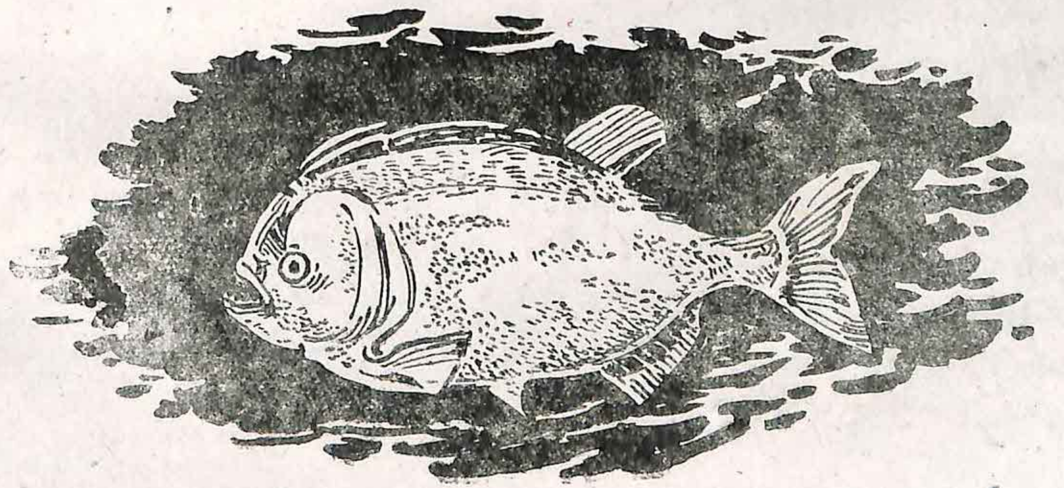
'তিমি মাছ' যে আসলে মাছই নয়, সেকথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাদের এক-একটি ছানা হয় ঘোড়ার মতো মস্ত ; তাহারা জন্মিয়া মায়ের দুধ খায়। মাছ যেমন অনায়াসে জলের নীচে ডুবিয়া থাকে—তিমি সেরকম পারে না। নিশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে বার বার জলের ওপরে উঠিতে হয়। কখনও কখনও জোরে নিশ্বাস ছাড়িবার সময় তাহার নাক হইতে গরম বাতাসের ঝাপটা ছুটিয়া সমুদ্রের উপর জলের ফোয়ারা উঠিতে থাকে। তাহা দেখিয়া শিকারীরা বুঝিতে পারে—ঐখানে তিমি।

রাক্ষুসে মাছ

বড় বড় কুমির হাঙ্গর, তারাই জ্যান্ত মানুষ খায়, আমরা ত এই জানি। এক হাত লম্বা নদীর মাছ, তারা যে আবার জানোয়ার দেখলে কামড়ে ধরে, এমন কথা ত শুনিনি। আমাদের দেশের নদীতে ত এমন রাক্ষুসে মাছ দেখা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এমাজন নদীর আশেপাশে এরকম মাছ দেখতে পাওয়া যায়। সে জায়গায় মানুষ যদি জলে নামে, তবে তাকে আধ মিনিটও জলে থাকতে হয় না, তার মধ্যেই মাছেরা তাকে কামড়িয়ে এমন রক্তারক্তি করে দেয় যে তাকে প্রাণের দায়ে জল ছেড়ে উঠে আসতে হয়। সে দেশের লোকে একে 'পিরাই' বলে।

বুলডগের মতো মুখ মাছটার, তার মধ্যে ছোট ছোট ছুঁচাল দাঁত; একেবারে ক্ষুরের মতো ধারাল। তার উপর মেজাজখানাও চেহারারই উপযুক্ত—জলের মধ্যে থেকে এক হাত লাফিয়ে ডাঙার মানুষকে কামড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নয়। আর যেখানে কামড়ে ধরে, সেখানের খানিকটা ছিঁড়ে না আসা পর্যন্ত সে কামড় ছাড়ে না। তার উপর এরা সব সময় দল বেঁধে ফেরে। হাঙ্গর কুমির যেখানে থাকে সেখানেও নাকি মাছ থাকে, নানারকম জলজন্তু থাকে; কিন্তু 'পিরাই' এর আড্ডা যেখানে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কোনো প্রাণীর থাকবার জো নেই। সেখানকার জলে যদি গরু ঘোড়া নামে তবে আর আস্ত ফেরে না। একবার একটা ষাঁড় ২০/২৫ হাত চওড়া একটা নদী পার হতে গিয়েছিল—কিন্তু বেচারার পার হওয়া হ'ল না। তার আগেই রাক্ষুসে মাছেরা তাকে খেয়ে শেষ করে দিল। এরকম দুর্ঘটনা অনেক জানোয়ারের ভাগ্যেই ঘটে থাকে—তার মধ্যে মানুষও বাদ পড়েনি। হাজার মাছ এক সঙ্গে কামড় দেয় আর এক-এক কামড়ে এক-এক খাবল মাংস উঠিয়ে আনে। দু-চার মিনিটের মধ্যে এক-একটা জানোয়ারকে খেয়ে শেষ করে দেয়।

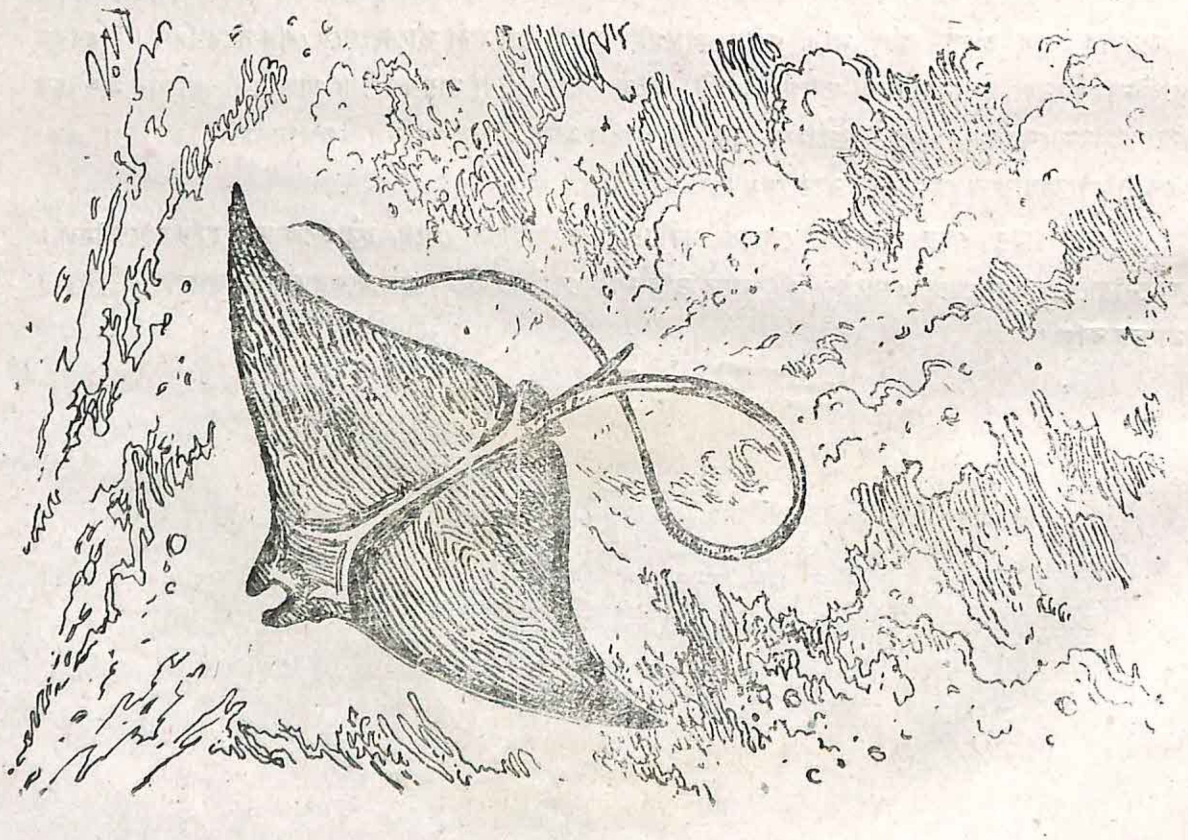
কত সময় এমন হয় যে, লোকে নদীতে জল আনতে গেছে, হঠাৎ কে তার হাত কেটে নিল। জানোয়ারেরা জল খেতে এসেছে—কট্ করে তার নাক কেটে গেল। সে দেশের লোকে জানে, এ পিরাই মাছের কাণ্ড!



অদ্ভুত মাছ

নদীতে আর সমুদ্রে যত রকম মাছ পাওয়া যায় তাহার মধ্যে অদ্ভুত মাছের কোনো অভাব নাই। কাহারও চেহারা অদ্ভুত, কাহারও চালচলন অদ্ভুত, কাহারও আহার-বিহার বাসাবাড়ি সবই অদ্ভুত ; বাস্তবিক ইহার মধ্যে কোনটার কথা যে বলিব আর কোনটা যে বাদ দিব তাহা ঠিক করাই কঠিন।

প্রথমে চারিচক্ষু মাছের কথা বলি। মাকড়সার নাকি আট-দশটা চোখ থাকে কিন্তু পোকামাকড় ছাড়া আর কোনো প্রাণীর যে দুইটার বেশি চোখ হয়, একথা আর শুনিয়াছ কি ? কোনো কোনো জানোয়ারের দেখা যায় কপালের কাছে একটা করিয়া চোখের মতো থাকে—কিন্তু 'চোখের মতো' হইলেও সেটা চোখ নয়, তাহাতে দেখার কাজ চলে না। কিন্তু এই মাছের যে দু-জোড়া চোখ, তাহার প্রত্যেকটিই সত্যিকারের চোখ। দুই-দুইটা চোখ একসঙ্গে উপর-নীচ করিয়া বসানো ; মাছ যখন জলে ভাসে তখন উপরের এক জোড়া চোখ থাকে জলের বাহিরে, আর নীচের জোড়া জলের তলায়। যে জোড়া জলের উপরে থাকে তাহার গড়ন ঠিক সাধারণ মাছের মতো নয়—তাহাতে জলের নীচে দেখিবার সুবিধা হয় না। আর



নীচের জোড়া ঠিক সাধারণমতো চোখ, তাহাতেও জলের বাহিরের কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখা যায় না। জলের ভিতর ও বাহির একসঙ্গে দেখিবার বিশেষ কোনো দরকার ইহার ছিল কি না জানি না, কিন্তু এ ব্যবস্থাটায় যে কাজের কতকটা সুবিধা হয় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। একরকম চশমা আছে তাহাকে 'বাইফোক্যাল্' বলে—সেই চশমার উপরের আধখানা একরকম কাচ, তাহাতে দূরের জিনিস দেখিবার সুবিধা হয়, আর নীচের আধখানা আরেক রকম—তাহাতে পড়াশুনার কাজ চলে। এই মাছের চোখটা ঠিক যেন 'বাইফোক্যাল' চোখ।

চোখের কথা বলিতে গেলে আরেকটি মাছের কথাও বলিতে হয়। সে মাছের একদিকে দুইটা চোখ, আর একদিকে চোখ নাই। এরকম একদিক কানা হইবার অর্থ কি জান? মাছটার স্বভাব এই যে, সে কাদার মধ্যে কাৎ হইয়া শুইয়া থাকে। যেদিকটা কাদার মধ্যে অন্ধকারে পড়িয়া থাকে, সেদিকটায় চোখ থাকা না থাকা সমান কথা—তাই তাহার দুইটা চোখই থাকে মুখের একপাশে—যে পাশটা আকাশের দিকে ফিরান সেই পাশে।

আফ্রিকার নীল নদীতে একরকম মাছ আছে সে চিৎ হইয়া চলে। চলার এরকম অদ্ভুত ভঙ্গি হইবার একমাত্র কারণ যাহা দেখা যায় তাহা এই যে, ইহাদের পেটের চাইতে পিঠের রংটা অনেক বেশি সাদা। সাদা পিঠটা আলোর দিকে থাকিলে চক্‌চক্ করে—তাহাতে মাছটার গা-ঢাকা দিয়া থাকিবার সুবিধা হয় না। তাই সে কালো পেটটাকে উপরের দিকে ধরিয়া আপনাকে জলের মধ্যে বেশ বেমালুম করিয়া রাখে।

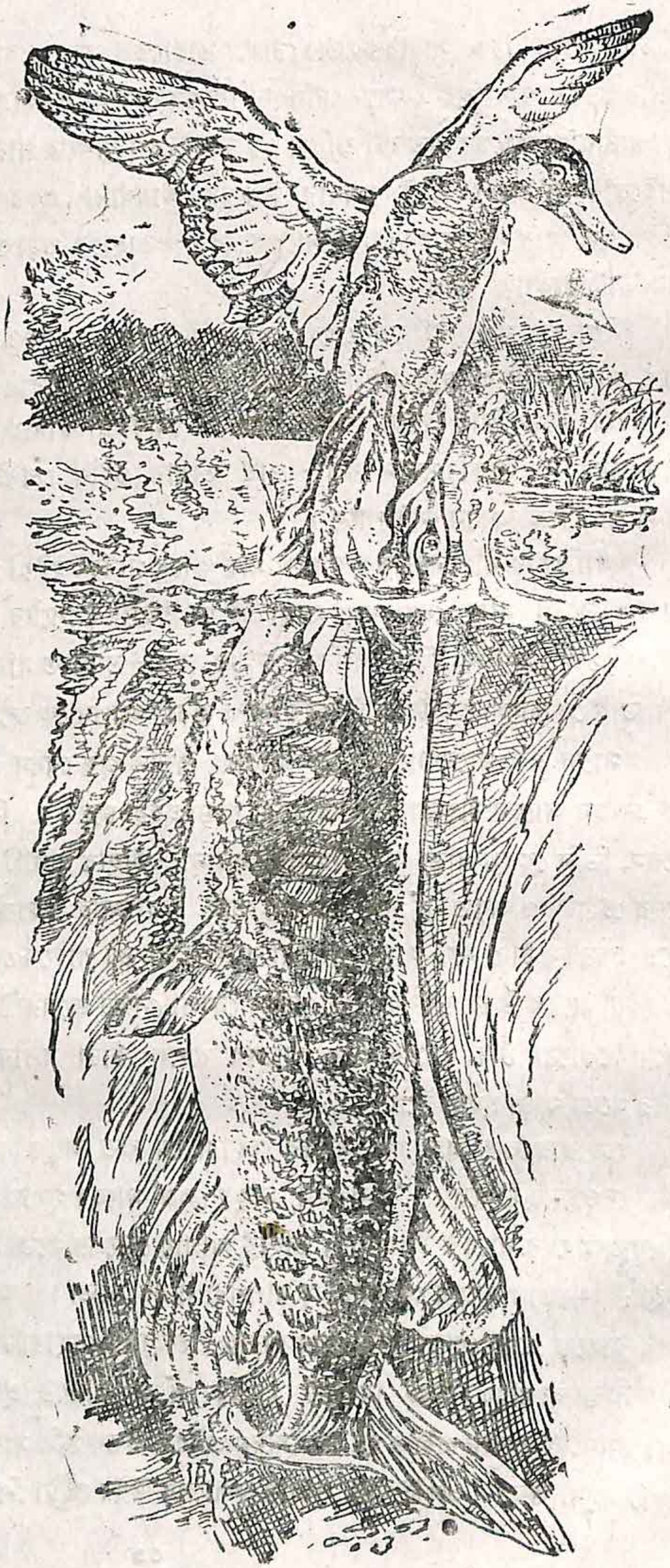
মানুষ এবং জানোয়ারের মধ্যে ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু যেমন খাড়া হইয়া চলে, মাছেদের মধ্যেও এমন এক-একজন আছেন যাঁহারা মানুষের মতো খাড়া হইয়া চলেন। বিশেষতঃ একজন আছেন, তিনি সমুদ্রে থাকেন, তিনি কেবল খাড়া থাকিয়াই সন্তুষ্ট হন না—তাঁহার মাথাটি আবার নীচের দিকে রাখা চাই। এই মাছের চেহারটিও অদ্ভুত ছুঁচাল রকমের, তাই ইংরাজিতে ইহার নাম Needle fish বা ছুঁচ মাছ। সমুদ্রে একরকম চাঁদা মাছ আছে, তাহারা রাগিলে বা ভয় পাইলে পেটটাকে ফুটবলের মতো ফুলাইয়া হঠাৎ চিৎ হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন ফোলা পেটটি জলের উপর বাহির হইয়া ভারি অদ্ভুত দেখায়। কোনো কোনো চাঁদা মাছের গায়ে আঁশের বদলে কাঁটা বসান থাকে—রাগের সময় সেগুলি শজারুর কাঁটার মতো খাড়া হইয়া উঠে।

চেহারার কথা যদি বল, মাছের চেহারা যে কত অদ্ভুতরকমের হইতে পারে তাহার কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হইতেছে। 'থলে-গলা চাবুক-লেজ' মাছের গলায় লম্বা থলি আর ল্যাজটি চাবুকের মতো; বঁড়শিবাজ মাছের নাকের উপর ছড়ি, তাহার আগায় টোপের মতো নোলক, আর যার যত বড় গা তত বড় হাঁ; শয়তান মাছের চেহারাটা মুখোশপরা সঙের মতো। আমেরিকার রাক্ষুসে মাছের সাংঘাতিক দাঁতের কামড়ে গোরু ঘোড়া পর্যন্ত প্রাণ হারায়—তাহারও চেহারাটি নেহাৎ ভদ্রমতন নয়।

কিন্তু বাস্তবিক উদ্ভট বিদ্‌ঘুটে মাছের খোঁজ করিতে হইলে সমুদ্রের গভীর জলে যেসব মাছ থাকে, তাহাদের সংবাদ লইতে হয়। সেদিন এইরূপ কতকগুলি মাছের চমৎকার বর্ণনা পড়িয়াছি। তাহার দু-একটি নমুনা শুন। একটি মাছ, তাহার কপালের উপর দুইটা শিং—সেই শিঙের আগায় তাহার চোখ।

শিং দুটাকে ইচ্ছামতো এদিক ওদিক ফিরাইতে পারে। তাহার গায়ে আবার সারি সারি আলো বসান—গভীর অন্ধকার সমুদ্রে সেগুলি আপনা হইতেই জ্বলিতে থাকে। আর একটা মাছ, তাহার মুখে লম্বা দাড়ি—দেখিতে অনেকটা গাছের পাতার মতো; তাহার উপর মুখভরা বড় বড় গজালের মতো দাঁত। অন্ধকারে সমস্তটা দাড়ি জ্বলিতে থাকে। আরেকটি মাছ তাহার চোখ দুইটা ঠোঁটের কোণায়, মনে হয় হাঁ করিলেই চোখ দুইটা গলিয়া যাইবে। ইহার নাকটা জুতার গোড়ালির মতো উঁচু আর হাঁ করিলেই মুখের ভিতরে আলো জ্বলিয়া উঠে—শিকার ধরিবার ভারি সুবিধা। আর একটি মাছ আছে, তাহার সমস্ত শরীরটি লাল কালো চিত্রবিচিত্র করা। তাহার চোখ দুইটা এত বড় যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে সমস্ত মাথাভরাই চোখ।

ইহারা সকলেই প্রায় শিকারী মাছ। নিজেদের বাতি দিয়া ইহারা শিকার খোঁজে। কেহ কেহ সমুদ্রের নীচে বাতি জ্বালাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে; সেই বাতি দেখিয়া যেসব শিকার তামাশা দেখিতে আসে, তাহাদের খপ্ করিয়া গিলিয়া খায়। কোনো কোনো মাছ আছে, তাহারা শিকারকে বাগাইবার জন্য নানারকম অস্ত্রকৌশল খাটাইয়া থাকে। কাহারও বিষাক্ত ল্যাজ চাবুকের মতো শিকারের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, কেহ বিদ্যুত চালাইয়া শিকারকে আড়ষ্ট করিয়া



পাইক মাছ হাঁসকে আক্রমণ করেছে

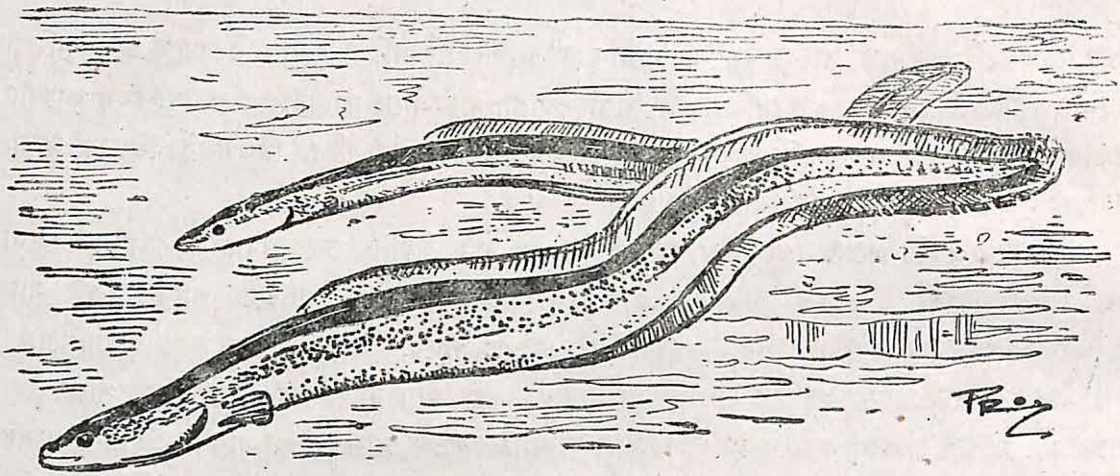
ফেলে, কেহ জোঁকের মতো তাহার রক্ত চুষিয়া খায়, আর পিচকারি মারিয়া ডাঙার শিকারকে জলে পাড়িয়া আনে। টিকটিকির শিকার ধরা দেখিয়াছ? কোনো কোনো মাছ আছে তাহারাও ঠিক সেইরকম কায়দায় শিকার ধরে। আস্তে আস্তে চুপি চুপি শিকারের পিছনে গিয়া তারপর হঠাৎ, টিকটিকির জিভের মতো, তাহাদের মুখটা সরু লম্বা হইয়া শিকারের ঘাড়ে ছুটিয়া পড়ে।

এইবারে একটা মাছের কথা বলিব, আমরা তাহার নাম দিয়াছি গেছো মাছ। কোনো কোনো মাছ আছে, তাহারা জলের বাহিরে আসিয়াও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিতে পারে। কই মাছ যে অনেকদূর পর্যন্ত মাটির উপর 'কাতরাইয়া' চলিতে পারে, তাহা বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ। কিন্তু মাছ যে আবার সখ করিয়া জল ছাড়িয়া ডাঙায় ওঠে আর রীতিমতো গাছে চড়িতে পারে, ইহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই মাছ আফ্রিকাতেই বেশি পাওয়া যায়। ইহার দু'পাশের ডানা দুইটি দেখিতে কতকটা আঙুল-জোড়া পায়ের মতো। সেই ডানার উপর ভয় করিয়া মাছগুলি অনায়াসে ডাঙায় উঠিয়া গাছে চড়িয়া বসে। ইহাদের মুখ প্রায়ই ব্যাঙের মতো কদাকার হয়—চোখ দুটিও সেইরকম ড্যাব্‌ডেবে। এ মাছ খাইতে এমন বিস্বাদ যে, মানুষ তো দূরের কথা—ডাঙার কোনো জন্তু বা আকাশের পাখিরা পর্যন্ত ইহাকে ছোঁয় না। কিন্তু জলের বড় বড় মাছগুলি ইহাদের দেখিলে টপাটপ্ খাইয়া ফেলে। সেইজন্য ইহারা জল ছাড়িয়া ডাঙায় উঠিবার জন্য এক এক সময়ে এমন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মাছের বিদ্যার কথা অনেক বলা হইল—এইবার আরেকটি বিদ্যার কথা বলিয়াই শেষ করি। সেটি আর কিছু নয়—সঙ্গীতবিদ্যা। অবশ্য সঙ্গীত বলিতে মনে করিও না যে, তাহারা রীতিমতো সা-রে-গা-মা সুর করিয়া রাগ-রাগিণীর চর্চা করে। কোনো কোনো মাছ আছে তাহারা একটু-আধটু শব্দ করিতে জানে। কেহ ইঁদুরের মতো কুটকুট শব্দ করে, কেহ অদ্ভুতরকম ঘঁৎ ঘঁৎ শব্দ করে, আর কেহ বা ডুব্‌ডুব্ করিয়া ঢাকের মতো আওয়াজ করে। কিন্তু সকলের চাইতে ওস্তাদ যে মাছ, সে দলেবলে সমুদ্রের তীরে পড়িয়া মোটা কান্নার মতো একরকম অদ্ভুত সুর করিতে থাকে। খানিক দূর হইতে শুনিলে হঠাৎ মনে হয় যেন মানুষের কোলাহলের সুর।

বিদ্যুৎ মৎস্য

এক-একরকম জানোয়ারের এক-একরকম অস্ত্র। কেউ শিং দিয়ে গুঁতোয়, কেউ নখ দিয়ে আঁচড়ায়, কেউ দেয় দাঁতের কামড়, কেউ মারে হুলের খোঁচা। ক্যাঙারুর ল্যাজের ঝাপ্‌টা, ঈগলের ধারাল ঠোঁট, অস্ত্র হিসাবে এগুলিও বড় কম নয়। কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য অস্ত্র আছে একরকম বান মাছের গায়ে। তোমরা কেউ 'ব্যাটারির শক্' খেয়েছ কি? কিংবা খোলা বিদ্যুতের তারে ভুলে হাত দিয়েছ কি? এই মাছকে ধরতে গেলে গায়ের মধ্যে ঠিক তেমনি ধাক্কা লাগে।



এই অদ্ভুত মাছকে ইংরাজিতে বলে Electric Eel অর্থাৎ 'বৈদ্যুতিক ঈল'। বান মাছের মতো চেহারা, সাপের মতো লম্বা, ধারাল দাঁত—এক-একটি ঈল পাঁচ-ছয় হাত পর্যন্ত বড় হয়। এই জাতীয় মাছ পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া যায়, কিন্তু যেগুলিতে বিদ্যুতের তেজ দেখা যায় সেগুলি থাকে কেবল আমেরিকার বড় বড় নদীর ধারে-কাছে। এক-একটা ঈলের এমন আশ্চর্য তেজ, তারা বিদ্যুত চালিয়ে অন্য মাছদের তো মেরে ফেলেই, এমনকি, বড় বড় জানোয়ারগুলোকেও এক-এক সময় তারা অস্থির করে তোলে। গোরু, ঘোড়া পর্যন্ত কত সময়ে জল খেতে নেমে ঈলের পাল্লায় পড়ে যন্ত্রণায় লাফালাফি করতে থাকে। সে দেশের লোকেরা রীতিমতো বর্শা বল্লম নিয়ে এই মাছ শিকার করে, কারণ, কোনোরকমে তার গায়ে গা ঠেকলেই বড় বড় জোয়ান মানুষকেও বাপ্‌রে মারে করে চেঁচাতে হয়। একবার কতগুলো ঘোড়া বিলের মধ্যে জল খেতে গিয়েছিল। সেখানে প্রায় ৪০/৫০ টা বড় বড় ঈল এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। ঘোড়াগুলো তার মাঝখানে পড়েই চিৎকার করে লাথি ছুঁড়ে ডাঙায় পালিয়ে আসল। কিন্তু একটা ঘোড়া তার মধ্যে একটু বেশি কাহিল হয়েছিল, সেটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জলের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়েছিল। ঈলগুলোও অবশ্য লাথির চোটে সেখানে বেশিক্ষণ টিঁকতে পারেনি।

এই সাংঘাতিক অস্ত্র এরা কেমন করে ব্যবহার করে, আর কেমন করে তাদের শরীরের মধ্যে এতখানি বিদ্যুত সঞ্চিত হয়, তা এখনও পণ্ডিতেরা খুব স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। মাছটাকে ধরে চিরলে পরে দেখা যায়, তার শিরদাঁড়ার দুই পাশে পিঠ থেকে ল্যাজ পর্যন্ত ছোট ছোট কোষ, তার মধ্যে একরকম আঠাল রস ; এইটিই তার বৈদ্যুতিক অস্ত্র। অস্ত্রের ব্যবহার করতে হলে সে কেবল তার শরীর-টাকে ঝাঁকিয়ে ল্যাজ আর মাথা শত্রুর গায়ে ঠেকিয়ে দেয়।

কয়েকবার ক্রমাগত অস্ত্রের ব্যবহার করলে মাছটা আপনা থেকেই কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে—তখন আর তার বিদ্যুতের তেজ থাকে না। কিন্তু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলে আবার তার তেজ ফিরে আসে

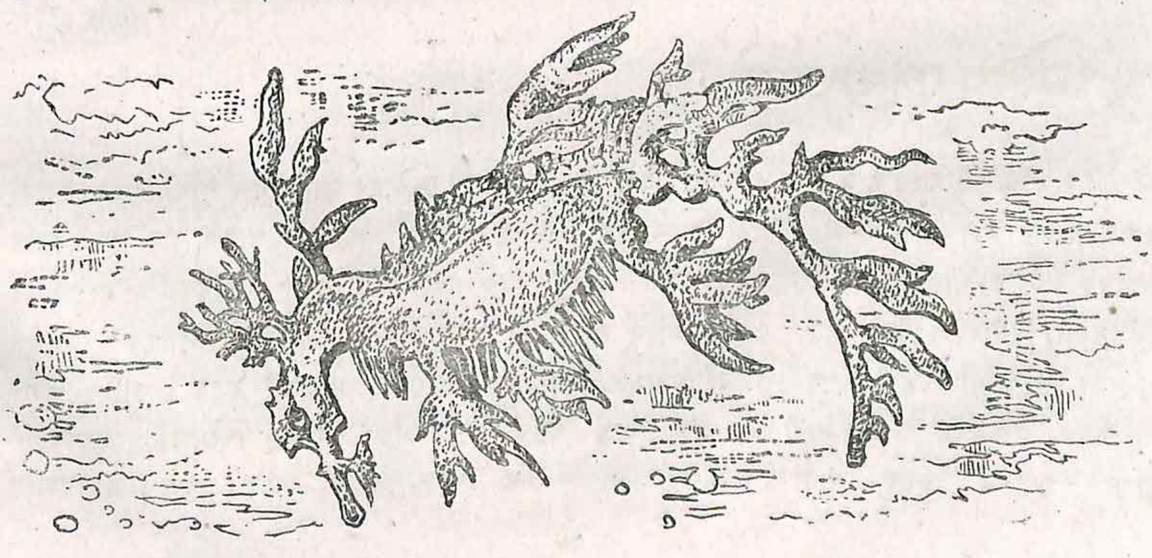
সব সময়ে যে ইচ্ছা করে সে খামখা অস্ত্র ব্যবহার করে, তা নয় ; কোনরকম ভয় পেলে বা চমকালেও তার গায়ে বিদ্যুত খেলে।

এরকম বৈদ্যুতিক শক্তি আরও কোনো কোনো মাছের ও অন্য জলজন্তুর মধ্যেও দেখা যায়। আফ্রিকায় মাগুর জাতীয় একরকম মাছ আছে, তারও তেজ বড় কম নয়। তার সমস্ত শরীরটাই যেন বিদ্যুতের কোষে ঢাকা। একটা চৌবাচ্চায় অন্যান্য মাছের সঙ্গে একে রাখলে তবে এর মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। দু'দিন না যেতেই দেখবে যে আর সব মাছকে মেরে সে সাবাড় করেছে। আফ্রিকার আরবেরা এর নাম বলে 'রাদ্' অর্থাৎ বজ্র মাছ।

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ঘোড়া বলতে হঠাৎ যেন সিন্ধুঘোটক মনে করে বসো না। সিন্ধুঘোটক থাকে সমুদ্রের ধারে, কিন্তু তাকে ঘোটক বলা হয় কেন তা জানি না। তার চালচলন চেহারা বা শরীরের গড়ন কিছুই ঘোড়ার মতো নয়—ঘোড়ার সঙ্গে তার খুব দূর সম্পর্কেরও কোনো সম্বন্ধ পাওয়া যায় না—অথচ তাকে বলি 'সিন্ধুঘোটক'। হিপোপটেমাসকে বাংলায় অনেক সময় 'জলহস্তী' লেখা হয়। তারও কিন্তু প্রকাণ্ড নাদুসনুদুস চেহারাটি ছাড়া হাতির সঙ্গে আর কোনরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং তাকে শুয়োরের সঙ্গে সমতুলনা করলে তার পরিচয়টা অনেকটা ঠিক হয়।

এখানে যাকে সমুদ্রের ঘোড়া বলছি, তাকে বর্মধারী মাছ বললেই তার ঠিকমতো পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু তার ঐ অদ্ভুত ঘাড়-বাঁকান চেহারা আর খাড়া হয়ে চলাফিরা—এই দেখেই ইংরেজিতে তার



নাম দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের ঘোড়া (Sea Horse)। চেহারার বর্ণনা হিসাবে নামটি যে চমৎকার হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। এই জন্তুর ল্যাজের দিকটা একেবারেই মাছের মতো নয়—তার উপর গায়ের চামড়াটিও চিংড়িমাছের খোলার মতো শক্ত। ল্যাজটি থাকাতে তার ভারি সুবিধা। যখন ইচ্ছা জলের নীচে শেওলা গাছে ল্যাজটি জড়িয়ে সে বেশ আরাম করে বিশ্রাম করে। যখন জলের নীচে মাথা উঁচিয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে এরা চলে-ফিরে, তখন তেজী ঘোড়ার টগ্‌বগ্‌ করে ছুটবার ধরনটাও মনে পড়ে। আসলে এরা যে 'নল' মাছের জাতভাই, সেটা এদের চোঙের মতো মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

নল মাছের চেহারাটা ঠিক তার নামেরই মতো। নল মাছের মুখখানা এমনভাবে তৈরী যে সে হাঁ করতে পারে না। ঐ চোঙার আগায় একটু ফুটো আছে, তাই দিয়ে সে সুড়সুড় করে খাবার টেনে খায়। সমুদ্রের ঘোড়ার মুখখানিও ঠিক এই ধরনের।

এই অদ্ভুত জন্তুগুলির এক একটা আবার ত্রিভঙ্গ ঘোড়ার মতো চেহারা করেও সন্তুষ্ট নয়। তারা নানারকম সাজ করে রংবেরঙের ঝালর ঝুলিয়ে কেমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি করে থাকে। ঝালরের সাজগুলো বাস্তবিক তার গায়ের চামড়া। ইংরেজিতে এদের বলে সমুদ্রের 'ড্রাগন' (Sea Dragon) বা রাক্ষস। নামটি ভয়ংকর হলেও জন্তুটি ঠিক সমুদ্রের ঘোড়ার মতোই নিরীহ। তার ঐ রংচঙে পোশাকের বাহারটা কেবল শত্রুর চোখে ধোঁকা দেবার জন্য। সমুদ্রের নীচে যেসব অদ্ভুত রঙিন বাগান থাকে, তারই মধ্যে ফুল-পাতার সঙ্গে রং মিশিয়ে এরা বেমালুম গা ঢাকা দিয়ে থাকে। নানারকম হিংস্র জন্তু আর মাছ সেখানে ঘোরে-ফিরে। তারা এর চেহারা দেখে হঠাৎ বুঝতেই পারে না যে, এটাও একটা জানোয়ার।

এদের আর একটি বড় মজার অভ্যাস আছে—এরা সব সময় ছানার দল সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ক্যাঙারুর পেটে যেমন থলি থাকে, তার মধ্যে ছোট ছোট ছানাগুলো দরকার হলেই ঢুকে পড়ে—তেমনি ওদেরও কারও বুকে, কারও পেটে ছোট ছোট থলির মতো থাকে। ছানারা ভয় পেলে ছুটে তার মধ্যে লুকোয়।

কুমিরের জাতভাই

টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, তক্ষক, গোসাপ এরা সকলে হলেন কুমিরের জ্ঞাতিবর্গ। পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাও, এদের কোনো-না কোনোটির সাক্ষাৎ পাবেই। কিন্তু সাক্ষাৎ পেলেই যে সব সময়ে তাদের চিনতে পারবে, তা মনে করো না। অস্ট্রেলিয়ার সেই কাঁটাওয়ালা ভীষণমূর্তি জানোয়ার যে নিতান্ত নিরীহ গিরগিটি মাত্র, একথা আগে থেকে না জানলে কেউ কি বুঝতে পারবে? কেবল চেহারা দেখে যদি এর সম্বন্ধে কোনো মতামত দিতে হয়, তাহলে অনেকেই হয়ত বেচারির উপর অবিচার করবে। সমস্ত শরীরটি এর অস্ত্রে আর বর্মে ঢাকা, কিন্তু মেজাজটি যারপরনাই ঠাণ্ডা। দুপুরের রোদে শুকনো বালির উপর এরা পড়ে থাকে, ভয় পেলে তাড়াতাড়ি

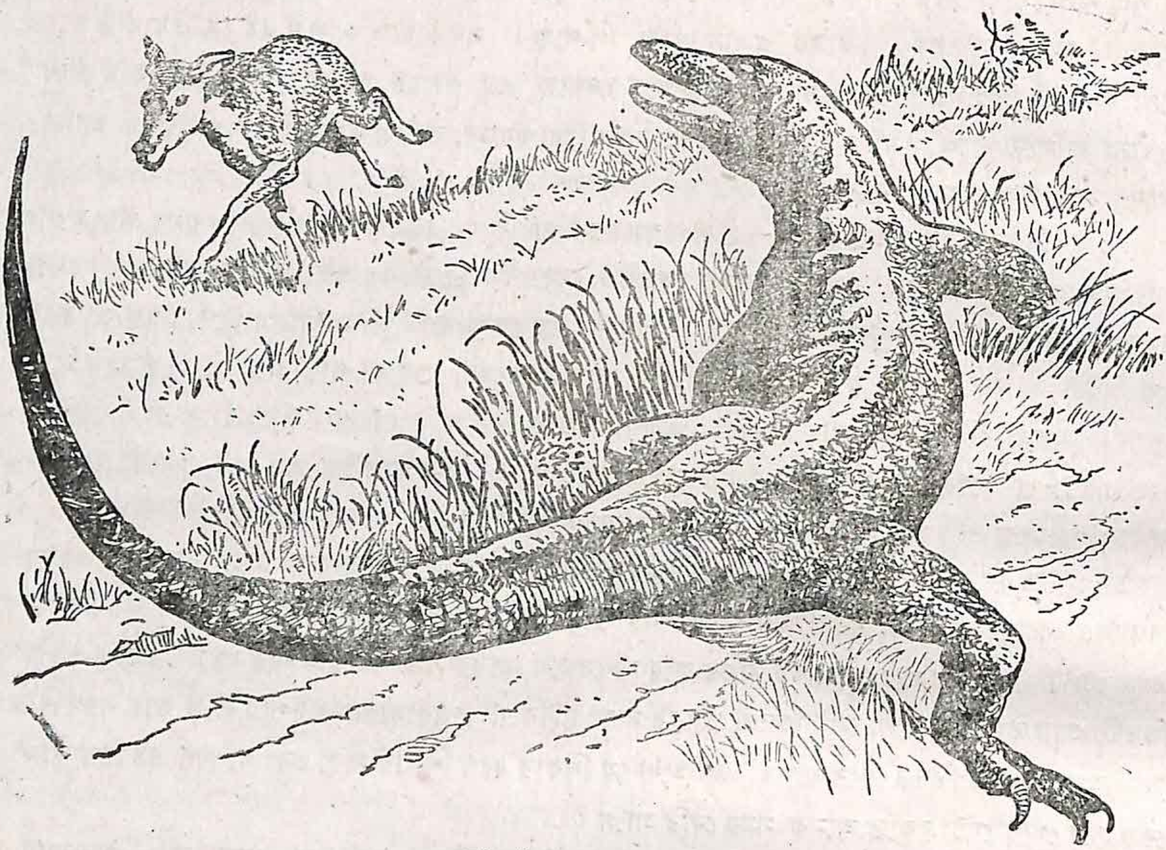
বালির মধ্যে ঢুকে যায়। অন্য জন্তুর অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, সামান্য একটা পাখি দেখলেই এরা পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়। এদের প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে। সব চাইতে আশ্চর্য এই যে, এক বাটি জলের মধ্যে যদি এই গিরগিটিকে ছেড়ে দাও, তবে দেখতে দেখতে এর গায়ের চামড়া সমস্ত জল শুষে নেবে। শুকনো বালিতে থাকে কিনা, সব সময়ে তো স্নানের সুবিধা হয় না, তাই একবার স্নান করলেই সে অনেক-দিনের মতো জল বোঝাই করে নেয়।

একটি সবুজ রঙের জন্তু রয়েছে—মাদাগাস্কারের টিকটিকি। এর বিশেষত্বের মধ্যে পায়ের আঙুলগুলি আর গায়ের রঙের বাহার। তাছাড়া রয়েছে বহুরূপী। বহুরূপীর গুণের কথা তোমরা সকলেই জান। তার সমস্ত গায়ের রং তারা চট্‌পট্ বদলাতে পারে। চোখে চেয়ে দেখছ তার দিব্যি ঘাসের মতো সবুজ রং, হয়ত এক মিনিট বাদেই দেখবে ফ্যাকাশে। তারপর ঘুরে এসে দেখ, শুকনো পাতার রং কিংবা সীসার মতো ময়লা। বহুরূপীর চালচলন ভারি অদ্ভুত। এক পা নড়তে হলে অতি সাবধানে ধীরে ধীরে সে পা ফেলে ; হয়ত একটা পা অর্ধেকখানা তুলে পাঁচ মিনিট চুপ করেই রইল। দেখে মনে হয় যেন পা ফেলবে কি না-ফেলবে এর জন্যে তার কত হিসাব আর কত ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে। এক সময়ে লোকের বিশ্বাস ছিল—অন্তত বিলাতে শিক্ষিত লোকেও একথা বিশ্বাস করত যে, বহুরূপীরা শুধু হাওয়া খেয়ে থাকে। এরকম বিশ্বাসের কারণ এই যে, বহুরূপী একে তো খায় খুবই কম, তার উপর খাওয়া কাজটি তার চক্ষের নিমেষে এমন চট্‌পট্ শেষ হয়ে যায় যে, একটু ঠাওর করে না দেখলে অনেক সময় বোঝাই যায় না। যতটুকু প্রাণী, জিভটি প্রায় ততখানি লম্বা, সেই জিভটি তীরের মতো ছট্‌কিয়ে পোকামাকড়ের উপরে পড়ে আর পরক্ষণেই টপ্ করে মুখের ভিতর ফিরে যায়। এর মধ্যে যে শিকার ধরা, শিকার মারা এবং খাওয়া, এই তিন কাজ শেষ হয়ে গেছে সেটা বুঝতে অনেক সময় দেরি লাগে।

বহুরূপীর আর একটি অদ্ভুত জিনিস তার চোখ দুটি। বড় বড় চোখ দুটি এমনভাবে তৈরী যে একবার চোখ পাকালেই উপর নীচ ডাইনে বাঁয়ে ডাঙা এবং আকাশের প্রায় সবখানিই বেশ দেখে নিতে পারে। তার উপর দুইটি চোখ একেবারে আলগাভাবে গাঁথা ; একটা যখন সামনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে, আর একটা হয়ত ততক্ষণ চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঘর বাড়ি গাছপালা সব তদ্‌বির করছে।

আর আছে বৃদ্ধ জরদগবের মতো এক জন্তু—আমেরিকার গেছো-গিরগিটি। গিরগিটি বললাম বটে কিন্তু গোসাপ বললেও চলত, কারণ এর এক একটি নাকি প্রায় সাড়ে তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গিয়েছে। গলায় গলকম্বল, পিঠে সাংঘাতিক কাঁটা, তার উপর কোনো-কোনোটার গায়ে মাথায় বড় বড় আঁচিল, তাতে চেহারাটা কেমন কিম্ভূতকিমাকার হয় তা সহজেই কল্পনা করতে পার।

খাঁটি গোসাপ-জাতীয় জন্তু আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। 'হিংস্র' বলতে যা বোঝায় গোসাপেরা ঠিক তা নয়, কিন্তু একবার গোঁ ধরলে সেও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের দেশে কথায় বলে 'কচ্ছপের কামড়,' সাহেবেরা বলেন 'বুলডগের কামড়'—কিন্তু গোসাপ ক্ষেপলে পরে তার কামড় ছাড়ানও কম শক্ত নয়। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে যে,



কামোডোর গোসাপ

গিরগিটিটাকে খুব বড় করতে পারলেই বুঝি ঠিক গোসাপ হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু বাস্তবিক গিরগিটি আর গোসাপের গড়নে কিছু তফাৎ আছে। গোসাপের ঘাড়টা অনেকটা লম্বা গোছের, আর তার জিভটা সাপের মতো চেরা, চলতে-ফিরতে লক্‌লক্‌ করে। গোসাপেরা আমিষখোর—সাপ, টিকটিকি, ইঁদুর, ব্যাং, পাখি, এইসব খেয়ে থাকে—তাদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য নাকি কুমিরের ডিম। আমাদের দেশে গোসাপ ডাঙায়ও থাকে জলেও নামে, তাই সাঁতারের সুবিধার জন্য তাদের ল্যাজগুলি চ্যাটাল হয়। যেসব গোসাপ কেবল শুকনো ডাঙায় বা গাছে থাকে, তাদের ল্যাজ হয় চাবুকের মতো গোল।

আরেক রকমের জন্তু রয়েছে যার গায়ে চক্র চক্র দাগ, সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর বীভৎস 'গিলা' (Gila Monster) বা বিষধর গিরগিটি। ছোট ছোট পা, তাতে শরীরটা মাটি থেকে আলগাই হয় না—তাকে সাপের মতো একে-বেঁকে মাটি ঘষে চলতে হয়। ছোট্ট দুটি চোখ, মুখভরা দাগের মধ্যে চট করে তাকে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। দুম্বা ভেড়ার মতো ল্যাজটি চর্বিতে ভরা। যখন খাবার জোটে না, তখন ঐ ল্যাজটা শুকিয়ে আসে, ল্যাজের চর্বি, সমস্ত শরীরে শুষে নিয়ে শরীরটাকে তাজা রাখে। কিন্তু আসল দেখবার জিনিস ওর মুখের মধ্যে। সেখানে যদি খোঁজ কর তবে দেখবে, ঠিক সাপের মতো তার বিষদাঁত রয়েছে। সে বিষে ছোটখাটো জন্তু বা পাখি তো মরেই, মানুষ পর্যন্ত মারা গেছে বলে শোনা যায়।

এক রকমের অদ্ভুত গিরগিটি আছে যে মনে হয় রাগে একেবারে ফুলে উঠেছে। তার গলায় যে রঙিন ছাতার মতো রয়েছে, সেটা অন্য সময়ে গুটিয়ে গলার চারদিকে পর্দার মতো ঝুলান থাকে, কিন্তু ভয় বা রাগের সময় খাড়া হয়ে ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়ে। তখন তার মুখের চেহারাটিও ভয়ানক হয়ে ওঠে। লাল ছাতার নীচে আগুনের মতো চোখ, তার উপর ঐরকম ধারাল দাঁত আর টকটকে জিভ—আর সেই সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করে লাফিয়ে ওঠা—এতে বাস্তবিক ভয় হবারই কথা। এই গিরগিটি দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে বেশ রীতিমতো ছুটতে পারে। ল্যাজসুদ্ধ এক-একটা প্রায় দু'হাত পর্যন্ত লম্বা হয়। এই জন্তুর বাড়ি অস্ট্রেলিয়ায়।

মালয় দেশে এবং ফিলিপাইন দ্বীপে আর একরকম গিরগিটি আছে, তাকে 'উড়ুক্কু গিরগিটি' বলা যেতে পারে। এদের পাঁজরের কয়েকখানা হাড় বুকের চামড়া ফুটো করে দু'পাশে বেরিয়ে থাকে, সেগুলো পাতলা পর্দার মতো চামড়া দিয়ে ঢাকা। পর্দাটাকে পাখার মতো ছড়িয়ে এরা এক গাছ থেকে আর এক গাছ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে উড়ে যায়। ছোটখাটো পোকা বা ফড়িং গাছের কাছ দিয়ে গেলে এরা চট্ করে তাদের উপর উড়ে পড়ে। এ ওড়া অবশ্য পাখির মতো ওড়া নয়, কারণ এরা রীতিমতো বাতাস ঠেলে উড়তে পারে না—লাফিয়ে বাতাসে ভর করে খানিকটা ভেসে যায় মাত্র। এরা থাকে বড় বড় গাছের আগায়, ক্বচিৎ কখনও নীচে নামে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে যেতে হলে এরা শূন্য দিয়েই যাতায়াত করে। এ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি রকমের উড়ুক্কু গিরগিটি পাওয়া গিয়েছে—তাদের সবগুলোরই রং অতি চমৎকার—কোনো ফুল বা প্রজাপতির রঙও তার চাইতে সুন্দর উজ্জ্বল হয় না। সমস্ত গায়ে যেন রামধনুর নকশা করা। এরাও কিন্তু বেশ রাগতে জানে, আর রাগলে পরে এদের গলাটি ফুলে তাতে নীল লাল নানারকম রঙের খেলা দেখা যায়।

এ ছাড়াও আরো কত রকমের গিরগিটি আছে, তাদের কথা বলবার আর জায়গা নেই। দাড়িওয়ালা গিরগিটি, শিংওয়ালা গিরগিটি, সাপের মতো গিরগিটি, মাছের মতো গিরগিটি, কত যে তাদের রকমারি তার আর অন্ত নেই। একটা আছে, তার কোন্ দিকটা ল্যাজ আর কোন্ দিকটা মাথা হঠাৎ দেখলে বোঝাই যায় না। আর একটার হাত-পাগুলো লম্বা লম্বা কাঠির মতো। ল্যাজটা গোড়ায় সরু, মাঝখানে মোটা, আবার আগায় ছুঁচাল—ঠিক যেন কাঁচা লঙ্কাটি। এদের অনেকে আবার রং বদলাতে জানে—কেউ কেউ এ বিষয়ে বহুরূপীর চাইতেও ওস্তাদ। কেউ ডিম পাড়ে, কারও বা একেবারে ছানা হয়, আবার কেউ বা এমন ঠুন্‌কো যে ধরামাত্র তার হাড়গোড় ভেঙে যায়।

অদ্ভুত কাঁকড়া

রাক্ষুসে কাঁকড়ার চেহারাটি তেমন কিছু ভীষণ নয়, গায়ের রংটিও বেশ সুন্দরই বলতে হবে—তবে একে রাক্ষুসে বলা হচ্ছে কেন ? 'রাক্ষুসে' বলার একমাত্র কারণ হচ্ছে তার দেহের আয়তনটি। খুব বড় একটি রাক্ষুসে কাঁকড়ার বড় দুটি দাঁড়া ফাঁক করিয়ে তার এক আগা থেকে আর এক আগা পর্যন্ত মাপ নিয়ে দেখা গেছে, দশ বার হাত লম্বা। এটা হ'ল কর্তা-কাঁকড়ার কথা—তার গিন্নী যে কাঁকড়ি, তাকে তো আর যখন তখন লড়াই করতে হয় না, কাজেই তার অত বড় দাঁড়াও নেই।

এই কাঁকড়া থাকে জাপান দেশে সমুদ্রের জলে। সেইখানে কূলের কাছে সমুদ্রের শেওলাধরা পাথরের মধ্যে রাক্ষুসে কাঁকড়া গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে। নামটি রাক্ষুসে হলেও এদের স্বভাবটি মোটেও রাক্ষসের মতো নয়—সেইজন্য নানা জাতীয় মাছ আর অক্টোপাস প্রভৃতি জলজন্তু এদের দেখতে পেলেই তেড়ে খেতে আসে। নানা রকম শেওলা প্রবাল আর 'স্পঞ্জ' তার গায়ের উপর বাসা করে তার আসল চেহারাটি এমন বেমালুম ঢেকে রাখে যে, খুব কাছে গেলেও অনেক সময় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়।

আরও কতকগুলি কাঁকড়া রয়েছে, যেগুলিকে গেছো-কাঁকড়া বলা যায়। এরা সত্যি সত্যি গাছে চড়ে কি না তা নিয়ে আগে নানা রকম তর্ক শোনা যেত, কিন্তু এখন এটা একেবারে সত্য বলে প্রমাণ হয়েছে। তবে এরা যে নারকেল গাছের আগায় চড়ে ডাব পেড়ে আনে, একথাটা অনেক সময় শোনা গেলেও এর কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা হোক, অল্পই উঠুক আর বেশিই উঠুক, ডাব পাড়ুক, আর নাই পাড়ুক, গাছে চড়া আর নারকেল খাওয়া এই দুই বিদ্যাতেই এর বেশ বাহাদুরি আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি ছোট ছোট দ্বীপে এই কাঁকড়ার বাড়ি। সেখানে নারকেল গাছের অভাব নেই, নারকেল মাটিতে পড়লেই গেছো-কাঁকড়া তাকে আক্রমণ করে। প্রথমত সে নারকেলটার ছোবড়া ছাড়িয়ে নেয়—এই ছোবড়া তাদের গর্তে বিছানার জন্য দরকার হয়। তারপর যেদিকে নারকেলের 'চোখ' থাকে, সেইদিকে দাঁড়া দিয়ে ঠুকে গর্ত করে সেই গর্তের মধ্যে দাঁড়া ঢুকিয়ে খুব মজা করে খায়। আস্ত নারকেলটিকে যে দাঁড়া দিয়ে ভাঙতে পারে—তার দাঁড়ার একটি চাপটে যে মানুষের হাড় পর্যন্ত ভেঙে দেয়, সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। কিন্তু তবু মানুষ তাকে ধরতে ছাড়ে না—কারণ, এ কাঁকড়া খেতে নাকি অতি চমৎকার! তার পায়ে এত চর্বি যে, সেই চর্বি গলিয়ে সে-দেশের লোকেরা তেল বার করে রাখে। তার উপর সে-দেশের বুনো শুয়োরগুলোরও কেমন বদভ্যাস—তারা গর্ত খুঁড়ে এই কাঁকড়াদের বার করে খেয়ে ফেলে।

রাক্ষুসে কাঁকড়ার মতো বড় না হলেও, এগুলিও নেহাৎ ছোট নয়। একবার এইরকম একটা কাঁকড়াকে একটা মজবুত টিনের বাক্সে বন্ধ করে বাক্সটাকে তার দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। কিন্তু পরের দিন দেখা গেল যে, কাঁকড়াটা বাক্সের ধার মুচড়িয়ে ফাঁক করে তা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।



সামনে মুখরোচক খাদ্য—কিন্তু দাঁড়ার বহর দেখে শুয়োর কামড় বসাতে সাহস পাচ্ছে না।

শামুক ঝিনুক

আমাদের শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটিকে আমরা কঙ্কাল বলি। কঙ্কালটা ভিতরে থাকে আর এই রক্ত-মাংসের শরীর তাহাকে ঢাকিয়া রাখে—এইরূপই আমরা সচরাচর দেখি। কিন্তু এমন জীবও আছে যাহার কঙ্কালটা থাকে শরীরের বাহিরে। এমন অদ্ভুত কাণ্ড কেহ দেখিয়াছ কি? বোধহয় সকলেই দেখিয়াছ; কারণ, আমি কোনো অসাধারণ বিদ্‌ঘুটে জন্তুর কথা বলিতেছি না—এই নিতান্ত সাধারণ শামুক ঝিনুক প্রভৃতির কথাই বলিতেছি।

শামুক ঝিনুকের মতো নিতান্ত সামান্য জিনিসের মধ্যে যে কত আশ্চর্য ব্যাপার লুকান থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তোমরা গেঁড়ি দেখিয়াছ? বাগানে পুকুরের কাছে স্যাঁৎসেঁতে জায়গায় ছোট ছোট জীবন্ত শামুকগুলি যারপরনাই অলসভাবে আস্তে আস্তে চলাফিরা করে—তাহাদের নাম গেঁড়ি। ঝিনুকের মধ্যে যে জীবন্ত প্রাণীটি বাস করে, তাহার চালচলনটিও কম অদ্ভুত নয়। তাহাদের অনেকেই সারা জন্ম মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কেহ কেহ এমন গোঁয়ার, তাহারা ক্রমাগত পাথর ফুঁড়িয়া তাহার ভিতর ঢুকিতে চায়। দুই-একজন আছে তাহারা লাফান বিদ্যাটি বেশ অভ্যাস করিয়াছে, কথা নাই বার্তা নাই, হঠাৎ তড়াক করিয়া এক-একটা লাফ দেয়। আর সমুদ্রের নীচে শুক্তিগুলো যে আপনাদের খোলার ভিতরে ছোট বড় নানা রকম মুক্তা জমাইয়া রাখে, তাহার কথাও তোমরা নিশ্চয়ই জান। একরকম পোকার জ্বালায় অস্থির হইয়া ঝিনুকের গায়ে রস গড়ায়, আর সেই রস জমিয়া মুক্তা হয়।

শামুক বা ঝিনুকের যখন জন্ম হয় তখন তাহাদের খোলাটি থাকে না, তাহার জায়গায় একটা পুরু চামড়ার মতো থাকে; সেই চামড়াটি শক্ত হইয়া ক্রমে মজবুত খোলা তৈরী হয়। যে ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, সেই ডিমগুলি দেখিতে বড়ই অদ্ভুত। কতকগুলি ছোট ছোট পোঁটলা একসঙ্গে মালার মতো বাঁধা থাকে। প্রত্যেকটি পোঁটলার মধ্যে কতকগুলি ডিম। এক একটি শামুক অনেকগুলি ডিম পাড়ে—একশ-দেড়শ হইতে দশ-বিশ হাজার। কিন্তু এ-বিষয়ে এক-একটা ঝিনুকের ওস্তাদি অনেক বেশি। সমুদ্র বা নদীর জলে এমন সব ঝিনুক দেখা যায় যাহারা একেবারে দশ-বিশ লাখ ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া যখন ছানা বাহির হয়, তখন তাহাদের খাইবার জন্য নানা রকম জীবজন্তু চারিদিক হইতে ঘিরিয়া আসে, কারণ, খোলা জমিবার আগে এই নরম অবস্থাতেই এগুলিকে খাইবার সুবিধা। বাস্তবিক, অল্প বয়সেই ইহারা যদি এরূপভাবে উজাড় না হইত, তবে শামুক ঝিনুকের অত্যাচারে পৃথিবীতে বাস করাই দায় হইত। যে প্রাণী এক-একবারে হাজার হাজার জন্মিতেছে তাহাদের প্রত্যেকটি যদি বড় হইতে পায়, আর প্রত্যেকের হাজার হাজার করিয়া ছানা হয়, আর এইরকম বছরের পর বছর চলিতে থাকে, তবে অবস্থাটা নিতান্তই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায় বৈকি। এরূপভাবে বাড়িতে পারিলে একটিমাত্র শামুকের বংশধরেরা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে সমস্ত কলিকাতা শহরটিকে একেবারে বেমালুম ঢাকিয়া দিতে পারিত।

বলিতে গেলে, এক সময় এই পৃথিবীতে ইহাদেরই রাজত্ব ছিল। সেকালের হিসাবেও ইহা খুবই পুরাতন সময়ের কথা। তখন আর কোনো জীবজন্তু ছিল না, কেবল নানারকম শঙ্খ আর অদ্ভুত জলজন্তুরা এই দুনিয়ার পরিচয় লইয়া ফিরিত। আজও তাহাদের কঙ্কাল জমিয়া কত মাটির নীচে কত সমুদ্রের বুকে বড় বড় স্তর বাঁধিয়া আছে।

গেঁড়ির কথা বলিতে গেলে সব চাইতে বড় যে আফ্রিকার রাক্ষুসে গেঁড়ি তাহার কথাও বলা উচিত। ইহারা একটি করিয়া লম্বা গোছের ডিম পাড়ে—ঠিক পাখির ডিমের মতো শক্ত আর সাদা।

কিন্তু সমুদ্রের শঙ্খ-জাতীয় জন্তুদের মধ্যে ইহার চাইতে অনেক বড় জীবও বিস্তর দেখা যায়। তাহাদের এক-একটির খোলা এমন প্রকাণ্ড হয় যে, একটি ছোটখাটো ছেলেকে তাহার মধ্যে অনায়াসে শোয়াইয়া রাখা যায়।

শামুকেরা খায় কি ? নরম ঘাস, কচি পাতা, জলের পানা—এইগুলি অনেকেরই প্রধান খাদ্য। আবার কেহ কেহ আছেন, তাহাদের নিরামিষে রুচি নাই, তাহারা নানা রকম পোকামাকড়, জলের কীট এই সকল খাইয়া থাকেন। ঝিনুকেরও খাওয়া এইরকমই, তবে তাহারা এক জায়গায় পড়িয়া থাকে বলিয়া তাহাদের আহার জুটিবার সুযোগ কিছু কম। ঝিনুকের খোলার দুটি করিয়া পাট থাকে, সে-দুটি তাহারা ইচ্ছামতো কব্‌জা ঘুরাইয়া খুলিতে ও জুড়িয়া দিতে পারে। খাবারের দরকার হইলে তাহারা সেই দরজা ফাঁক করিয়া রাখে ; চলিতে চলিতে অথবা স্রোতে ভাসিয়া যে সকল কীট সেই হাঁ-করা মুখের মধ্যে আসিয়া পড়ে তাহাদের সে চট্‌পট্‌ খাইয়া ফেলে। শামুক আর ঝিনুকের খাওয়ার মধ্যে আর একটি তফাৎ এই যে, ঝিনুকের দাঁত নাই কিন্তু শামুকের দাঁত আছে। দাঁত বলিতে মানুষের দাঁতের মতো কিছু-একটা মনে করিও না। এই দাঁতগুলি তাহাদের জিভের গায়ে অতি সূক্ষ্মভাবে সাজান থাকে ; এক-একটা শামুকের প্রায় দুই-চারশ বা হাজার দেড় হাজার দাঁত। উখার মতো ধারাল এই জিভটিকে সে তাহার খাবারের ভিতরে, উপরে, আশেপাশে ঘ্যাঁশ্‌ ঘ্যাঁশ্‌ করিয়া চালাইতে থাকে। তাহাতেই খাবার জিনিস সব টুকরা টুকরা হইয়া থ্যাঁৎলাইয়া কাদার মতো নরম হইয়া যায়। এক-একটার জিভের আগা পর্যন্ত সাংঘাতিক ধারাল ; সেই জিভ দিয়া তাহারা অন্য জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া দেয়, নিরীহ ঝিনুকগুলির খোলা ফুঁড়িয়া তাহাদের চুষিয়া খায়।

তারপর শামুক ঝিনুকের চেহারার বাহার যদি বর্ণনা করিতে বসি, তবে তো শেষ করাই মুশকিল হইবে। কত হাজার রকমের শঙ্খ, তাহার কত রকম আকার, কত রকম রং। তার এক-একটার যে কী আশ্চর্য সুন্দর গড়ন, শুধু কথায় তাহা আর কত বোঝান যায়!

সিন্ধু ঈগল

সমুদ্রের ধারে যেখানে ঢেউয়ের ভিতর থেকে পাহাড়গুলো দেয়ালের মতো খাড়া হয়ে বেরোয় আর সারা বছর তার সঙ্গে লড়াই করে সমুদ্রের জল ফেনিয়ে ওঠে, তারই উপরে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চূড়ায় সিন্ধু ঈগলের বাসা। সেখানে আর কোনো পাখি যেতে সাহস পায় না—তারা সবাই নীচে পাহাড়ের গায়ে ফাটলে ফোকরে বসবাস করে। পাহাড়ের উপরে কেবল সিন্ধু ঈগল—তারা স্বামী-স্ত্রীতে বাসা বেঁধে থাকে।

ঈগলবংশ রাজবংশ—পাখির মধ্যে সেরা। সিন্ধু ঈগলের চেহারাটি তার বংশেরই উপযুক্ত—মেজাজটিও রাজারই মতো। সিংহকে আমরা পশুরাজ বলি—সুতরাং ঈগলকেও পক্ষীরাজ বলা উচিত ; কিন্তু তা আর বলবার জো নেই, কারণ রূপকথার আজগুবী গল্পে লেখে, পক্ষীরাজ নাকি একরকম ঘোড়া ! যা হোক—শুনতে পাই, রাজারা নাকি মৃগয়া করতে ভালবাসেন। তাহলে সে হিসাবেও সিন্ধু ঈগলের চালের কোনো অভাব নেই। চিল কাক সাঁচান শকুন সবাই মরা মাংস খায়—কাজেই, সেরকম খাওয়া যতক্ষণ জোটে ততক্ষণ তাদের আর শিকার করা দরকার হয় না। কিন্তু সিন্ধু ঈগলের স্বভাবটি ঠিক তার উল্টো—যতক্ষণ শিকার জোটে ততক্ষণ সে মরা জানোয়ার পেলেও তা ছোঁয় না। কিন্তু একটি তার বদভ্যাস আছে, সেটাকে ঠিক রাজার মতো বলা যায় না ; সেটি হচ্ছে অন্যের শিকার কেড়ে খাওয়া।

সমুদ্রের ধারে ছোট বড় কত রকম পাখি—তারা সবাই মাছ ধরে খায়। নিতান্ত ছোট যারা তারা ধরে ছোট ছোট মাছ—সেসব মাছের উপর সিন্ধু ঈগলের কোনো লোভ নাই। কিন্তু বড় বড় গাংচিল আর মেছো-চিলগুলো যেসব বড় বড় মাছ জল থেকে টেনে তোলে তার দু-চারটা যে মাঝে মাঝে সিন্ধু ঈগলের পেটে যায় না, এমন নয়। সমুদ্রের ধারে শিকারের অভাব কি ? মাছ খেয়ে যদি অরুচি ধরে, তবে এক-আধটা পাখি মেরে নিলেই হয়। তাছাড়া একটু ডাঙার দিকে ইঁদুর খরগোশ এমনকি ছাগলছানাও পর্যন্ত মিলতে পারে। কিন্তু তবু সে অন্যের শিকারে জবরদখল জাহির করতে ছাড়ে না। এই যে ডাকাতি করে কেড়ে খাওয়া, এ বিদ্যায় সিন্ধু ঈগলের বেশ একটু কেরামতি আছে। তারা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে ডাকাতি করে। সারাদিন তারা আকাশে উড়ে উড়ে বেড়ায়। উড়তে উড়তে কোথায় গিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন সে মেঘের রাজ্যে চলে গিয়েছে, পৃথিবীর উপর বুঝি তার কোনো দৃষ্টি নেই। কিন্তু ঈগলের চোখ বড় ভয়ানক চোখ। ঐ উঁচুতে থেকেই সে সমস্ত দেখছে—কিছুই তার চোখ এড়াবার জো নাই। ঐ যে কত পাখি জলের ধারে খেলছে, আর মাছ ধরছে, তার মধ্যে একটা মেছো-চিল ঘুরে ঘুরে শিকার খুজছে—ঈগল পাখির চোখ রয়েছে তারই উপর।

জলের নীচে একটা মাছ বার বার উঠছে আর নামছে, চিল কেবল তাই দেখছে—মাথার উপরে যে ঈগলরাজ টহল দিয়ে ফিরছেন সেদিকে তার খেয়ালই নাই। একবার মাছটা যেই



ভেসে উঠেছে, আর অমনি ছোঁ করে মেছো-চিল জলের উপর পড়েছে। তারপর মাছসুদ্ধ টেনে তুলতে কতক্ষণ লাগে! চিল ভাবছে এখন একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ভোজনে বসবে, এমন সময়, চিঁ হিঁ হিঁ হীঁ—ভূতের হাসির মতো বিকট চীৎকার করে কি একটা প্রকাণ্ড ছায়া তার ঘাড়ের উপর ঝড়ের মতো তেড়ে নামল। সে আর কিছু নয়, সিন্ধু ঈগল; ঐ-মাছটার উপর তার নিতান্তই লোভ পড়েছে। তাড়া খেয়ে চিলের বাচ্চা পালাতে পারলে বাঁচে, কিন্তু পালাবে কোথায়? দু'দিক থেকে দুইটা ঈগল ক্রমাগত তেড়ে তেড়ে ছোবল মারছে, তার একটি ছোবল গায়ে লাগলে হাড়ে মাংসে আলগা হয়ে যায়। তার উপর সেই বিকট আওয়াজ যখন কানের কাছ দিয়ে হেঁকে যায় তখন বুদ্ধিসুদ্ধি আপনা হতেই ঘুলিয়ে আসে। কাজেই, মেছো-চিলের মাছ খাওয়া এবারে আর হ'ল না। সে বারকয়েক ঈগলের ঝাপটা এড়িয়ে তারপর প্রাণের ভয়ে মাছটাছ ফেলে পালাল।

সিন্ধু ঈগল অনেক সময় সমুদ্র ছেড়ে বড় বড় নদীর ধারে গাছের উপর বাসা বাঁধে। সে-বাসাও একটি দেখবার মতো জিনিস। এক-একটা বাসা ৫।৭ হাত চওড়া; বছরের পর বছর সেটাকে তারা ক্রমাগতই উঁচু করে একটা রীতিমতো সিংহাসন বানিয়ে তোলে। এই বাসা বানানো ব্যাপারটা নাকি দেখতে ভারি মজার। একটা ঈগল অনেক কষ্ট করে কতকগুলো ডাল সংগ্রহ করে আনল—আর একটা হয়ত সেগুলো পছন্দই করল না। এমনি করে যত ডালপালা যোগাড় হয় তার অধিকাংশই খামখা নেড়েচেড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তখন তা নিয়ে তাদের মধ্যে ভারি একটা ঝগড়া লেগে যায়; তারা বাসা বানানো বন্ধ রেখে মুখ ভার করে বসে থাকে। আবার হঠাৎ খানিক বাদেই তারা আপসে ভাব করে বাসা বানাতে লেগে যাবে।

এরা সাধারণত মানুষকে কিছু বলে না—বরং তাড়া করলে বাসাটাসা ফেলে পালায়। তবে বাসায় যদি ছানা থাকে, তাহলে তাড়াতে গেলে অনেক সময়ে উল্টে তেড়ে আসে। তখন দেখা যায় তাদের তেজ কেমন সাংঘাতিক। একবার এক সাহেবের চাকর তামাশা দেখবার জন্য গাছে উঠে ঈগলের বাসায় উঁকি মারতে গিয়েছিল। তাতে ঈগলেরা তাকে তেড়ে এসে এমনি সাজা দিয়েছিল যে, সাহেব বন্দুক নিয়ে ছুটে না আসলে সেদিন তার তামাশা দেখবার শখ একেবারে জন্মের মতো ঘুচে যেত।

ধনঞ্জয়

এ পাখির ইংরাজি নাম হর্নবিল্ (Hornbill) অর্থাৎ শৃঙ্গচঞ্চু কিন্তু তার আসল বাংলা নামটি যে কি, তা আর খুঁজে পেলাম না। লোকে তাকে ধনঞ্জয় বা ধনেশ পাখি বলে কিন্তু অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি, ও নামে পাখিই নেই। ওর কাছাকাছি একটা আছে, তার নাম ধনচ্চু—'হাড়গিলার আকার-বিশিষ্ট পক্ষীবিশেষ, করেটু পক্ষী'। 'করেটু' মানে 'কর্করেটু পক্ষী—'কর্করেটু' মানে 'করটিয়া পক্ষী'। আবার 'করটিয়া'র মানে দেখতে গেলে আরও কত নাম বেরুতে পারে, সেই ভয়ে আর দেখা হ'ল না। যা হোক, নাম দিয়ে যদি কেউ চিনতে না পারে, তবে চেহারাটা দেখলে তার পরিচয় পেতে বোধ হয় দেরি হবে না—কারণ, এ চেহারা একবার দেখলে আর সহজে ভুলবার জো নেই।



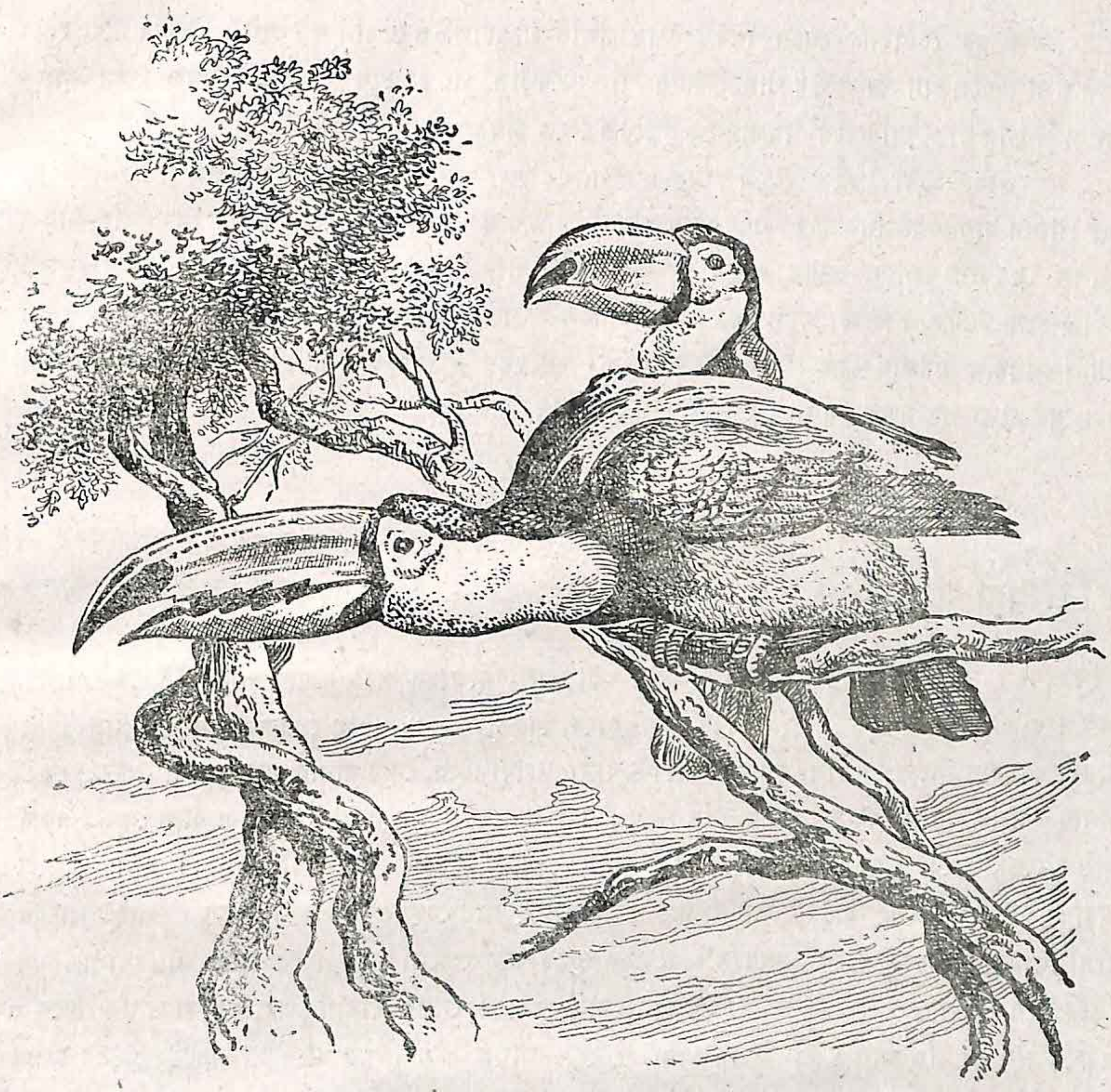
আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যত অদ্ভুত পাখি আছে, তার মধ্যে 'ফার্স্ট প্রাইজ' কাউকে দিতে হলে বোধহয় একেই দেওয়া উচিত। আমরা ছেলেবেলায় যখন এই পাখিকে প্রথম দেখি তখন তার নাম দিয়েছিলাম 'দুই-ঠোঁট-ওয়ালা পাখি'। বাস্তবিক কিন্তু এর একটা মাত্রই ঠোঁট। উপরেরটা শিং বলতে পার—সেটার সঙ্গে তার মুখ বা ঠোঁটের কোনো সম্পর্কই নেই। অত বড় একটা জমকালো শিং দিয়ে তার কি যে কাজ হয়, তা দেখতে পাই না। অত্যন্ত নিরীহ পাখি, কারও সঙ্গে

গুতাগুঁতি করবার সাহস তার আছে কি না সন্দেহ। চেহারা দেখলে মনে হয়—'বাপরে! এই ঠোঁটের একটি ঠোকর খেলেই তো গেছি।' কিন্তু নিতান্ত ঠেকা না পড়লে গুঁতা মারার অভ্যাসটিও তার নেই বললেই হয়।

এত বড় ঠোঁট, তার উপর এমনধারা শিং, এই বিষম বোঝা বয়ে বয়ে পাখিটার মাথাও কি ধরে না? চলতে ফিরতে উড়তে গিয়ে সে কি উল্‌টেও পড়ে না? আসল কথা কি জান? তার ঠোঁটটি আর শিংটি আগাগোড়াই ফাঁপা, কাঁকড়ার খোলার মতো হালকা। তাই তার ঠোঁট নিয়ে বড় বড় গাছের আগডালের উপরে সে লাফিয়ে বেড়ায়—খাবার দেখলে ঝুপ করে উড়ে এসে পড়ে। কেবল তাই নয়, তার দিকে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দেখ দেখি, সে কেমন চটপট ঘাড় ফিরিয়ে তার বিশাল ঠোঁটের মধ্যে খাবার লুফে নেবে। এ বিষয়ে তার মতো ওস্তাদ আর বোধহয় দ্বিতীয় নেই; আর এমন খানেওয়ালাও বোধহয় আর একটি পাওয়া দুষ্কর।

এক সাহেবের এক পোষা ধনঞ্জয় ছিল—সে আমাদের দেশে নয়, বোর্নিও দ্বীপে। সে দেশে এই পাখি অনেকেই পুষে থাকে। সাহেব বলেন, এমন সর্বনেশে পেটুক জীব আর কোথাও মেলে না। সেই এতটুকু বাচ্চা বয়স থেকেই তাকে খাইয়ে খাইয়েও মানুষে ঠাণ্ডা রাখতে পারত না। এইমাত্র খাইয়ে গেলে, আবার পাঁচ মিনিট পরেই দেখবে হতভাগা ল্যাজের উপর ভর দিয়ে পা মুড়ে বসে বসে প্রকাণ্ড হাঁ ঝরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে বিকট কান্না লাগিয়েছে। তারপর একটু বয়স হলে তখন তার অত্যাচারে বাড়িতে টেঁকা দায় হয়ে উঠল। খাবার সময় তার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে তাকে আটকে রাখতে হ'ত, তা নইলে সে পাতের খাবারে, ভাতের হাঁড়িতে, ব্যঞ্জনের বাটিতে, দুধের কড়ায়, যেখানে সেখানে মুখ দিয়ে সকলকে অস্থির করে তুলত। মাছমাংস, ডালভাত, রুটিবিস্কুট, ময়দার ডেলা যা দাও তাতেই সে খুশী, কিন্তু পেটভরে দেওয়া চাই। পেটটি ভরলেই সে উড়ে গিয়ে গাছের আগায় বিশ্রাম করবে, রোদ পোহাবে আর প্রাণপণে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নতুন করে সাংঘাতিক খিদে ডেকে আনবে।

ধনঞ্জয় পাখির চালচলন স্বভাব যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা বলেন, এই পাখির বাসা বাঁধবার ধরনটি তার চেহারার চাইতে কম অদ্ভুত নয়। যখন ছানা হবার সময় হয় তখন মা-পাখিটা একটা গাছের কোটরের মধ্যে আশ্রয় নেয়, আর বাবা-পাখি সেই কোটরের মুখটাকে কাদামাটি শেওলা দিয়ে বেশ করে এঁটে বন্ধ করে দেয়—কেবল একটুখানি ফোকর রাখে, তা না হলে বাইরে থেকে খাবার দেবে কি করে? সেই কোটরের মধ্যে ডিম পেড়ে মা-পাখি দিনের পর দিন তার উপর বসে বসে তা দেয়। আর বাবা-পাখি বাইরে থেকে পাহারা দেয়, আর ফোকরের ভিতর দিয়ে সারাদিন খাবার চালান করে। এমনি করে যখন ডিম ফুটে ছানা বেরোয়, আর সেই ছানাগুলো যখন একটু বড় হয়, তখন বাসা ভেঙে মা-পাখি বেরিয়ে আসে। এতদিন বদ্ধ জায়গায় বসে বসে তার পা এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে কোটর থেকে বেরোবার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে উড়তে পারে না, ভাল করে চলতে-ফিরতেও পারে না। এই বাসা গড়া ও ভাঙার সময় ধনঞ্জয়ের লম্বা ঠোঁট আর শিং এ দুটোই বোধহয় বেশ কাজে লাগে।



ধনঞ্জয় পাখি আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নানা জায়গায় বাস করে এবং তার নানা রকম চেহারা দেখা যায়। উড়িষ্যা দেশে এ পাখির নাম 'কুচিলাখাই'। 'কুচিলাখাই'য়ের গায়ের রং কালো, তার উপর ঠোঁট আর শিঙের চকচকে লালচে হলুদ দেখতে বেশ মানায়। নেপালের লাল ধনঞ্জয়ের শিং নেই বললেই হয়, কিন্তু তার মুখে মাথায় খুব গম্ভীর গোছের কেশর আছে আর ঠোঁট দুটো করাতের মতো দাঁতাল। সুমাত্রা দ্বীপের ধনঞ্জয়ের শিং একেবারেই নেই, কিন্তু তার জমকালো কেশরটি অতি চমৎকার ধবধবে সাদা। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের শিংও আছে, কেশরও আছে। শিঙের রকমারিও অনেক দেখা যায়— কারও শিং খড়্গের মতো বাঁকা, কারও কিরিচের মতো সোজা, আবার একজন আছেন তার শিংটি শশার মতো গোল, তার উপরে ঝুঁটি।

ধনঞ্জয়ের চেহারাটি যেমন বিকট তার গলার আওয়াজটিও তেমনি কট্‌কটে। বনের মধ্যে হঠাৎ তার গলা শুনলে পাখিরা ত ভয় পায়ই, বাঁদর বা বনবেড়াল পর্যন্ত ভয়ে পালায়, এমনও দেখা যায়। তা ছাড়া তার মাংস নাকি এমন বিস্বাদ যে কুকুরেও খেতে চায় না।

ধনঞ্জয়ের কথা বলতে গেলে আর-এক পাখির কথা বলতে হয়—তার নাম টুকান (Toucan)। এই পাখির বাসা আমেরিকায়। এদের গায়ে অনেক সময়ে খুব জমকালো রঙের বাহার দেখা যায়—কিন্তু আসল দেখবার জিনিস এদের সাংঘাতিক লম্বা ঠোঁট দুখানি। দেখলে মনে হয় যত বড় পাখির তত বড় ঠোঁট—যেন 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি'। তাতে চেহারাটি কেমন খোলে, তার আর বেশি বর্ণনা করবার দরকার নেই। দেখতে অনেকটা ধনঞ্জয়ের মতো হলেও আসলে এরা ধনঞ্জয় নয়—আর ধনঞ্জয়ের মতো অত বড়ও হয় না।

পাখির বাসা

মানুষ যেমন নানা রকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি ; কারো এক-চালা, কারো দো-চালা—পাখিরাও সেরকম নানান্ জিনিস দিয়ে নানান্ কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডাল-পালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে ; তার গড়নই বা কত রকমের—কারো বাসা কেবল একটি ঝুড়ির মতো, কারো বাসা গোল, কারো বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক-একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই বা কত খরচ করেছে আর মেহনতই বা করেছে কত! বাবুই পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধহয়। কেমন সুন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোনো জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর একটা উপায় তারা করেছে—অনেক সময় বাসার গায়ে আর একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভিতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

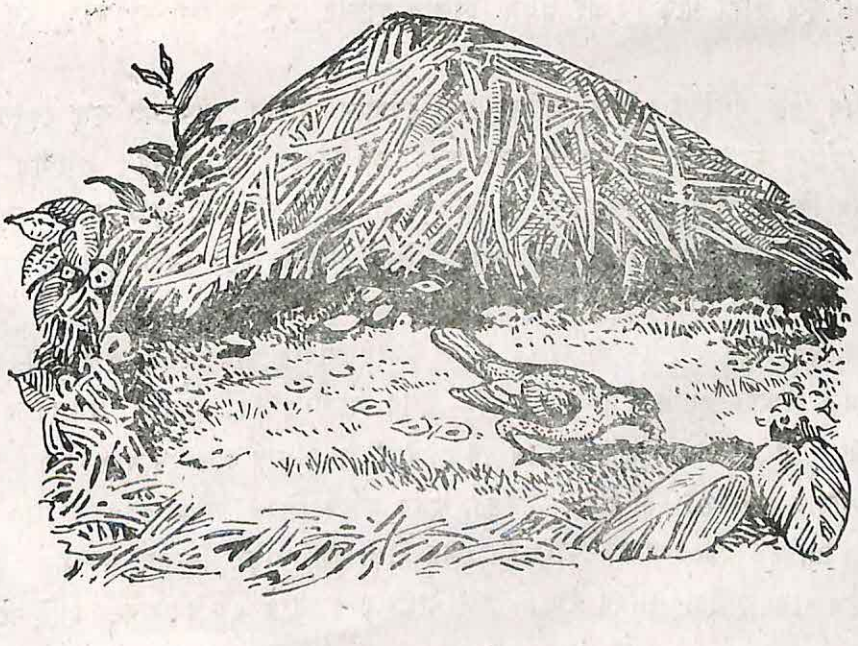
টুনটুনি পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটা বাটির মতো তৈরি করে ; তার মধ্যে নরম ঘাস পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহার করে ; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হ'ল তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোট জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ঐরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে ; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ

কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোনো কোনো পাখি সুন্দর করে লতাপাতা দিয়ে কুঞ্জবনের মতো বানায়। অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সুন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোট বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোট হয় না। এদের আবার রংচঙে জিনিসের বড় সখ; ভাঙা কাচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারিদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোনো কোনো পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এসব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবল থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীনদেশে এ বাসার খুব আদর; তারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সে-দেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরী। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরো অনেক জাতের পাখি কাদার বাসা বানায়; তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধহয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতর বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ-ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড় পটু।



মাছি

আমার সামনে টেবিলের উপর এক টুকরা চিনি পড়িয়াছিল। একটা মাছি খুব মন দিয়া সেইটাকে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিনির কাছে মুখ রাখিয়া সে অনেকক্ষণ স্থির হইয়া আছে, মনে হয় সে একটা ভারি ভাবনায় পড়িয়া হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, সে এখন আহারে ব্যস্ত। তাহার মুখের তলায় শুঁড়ের মতো কি একটা জিনিস বার বার ওঠানামা করিতেছে। একবার চকিতে চিনির উপর ঠেকিয়া আর মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ঢুকিয়া যাইতেছে। কাজটা এত চটপট তাড়াতাড়ি চলিতেছে যে ভাল করিয়া না দেখিলে চোখে ধরাই পড়ে না।

ভাবিলাম এই বেলা মাছিটাকে ধরিয়া ফেলি। কিন্তু মাছিটা আমার চাইতেও অনেকখানি চটপটে, আমার হাত একটু নড়িতেই সে ব্যস্ত হইয়া উড়িয়া গেল। বাস্তবিক, মাছির চোখ এড়ান খুবই শক্ত। ঐ যে তাহার লালমতো মাথাটি দেখিতে পাও, ঐ সমস্ত মাথাটি তাহার চোখ। একটি নয়, দুটি নয়, হাজার হাজার চোখ। অনুবীক্ষণ দিয়া বেশ বড় করিয়া দেখিলে মনে হয়, মাথাটি যেন অতি সূক্ষ্ম জাল দিয়া মোড়া। আরো বড় করিয়া দেখিলে দেখা যায় সেই জালের প্রত্যেকটি ফোকর এক-একটি আস্ত চোখ। প্রত্যেকটি চোখের ভিতর একটি পর্দা—প্রত্যেকটি পর্দার উপর বাহিরের জিনিসের এক-একটি অতি ক্ষুদ্র ছায়া পড়ে। এই রকম হাজার হাজার চক্ষু মেলিয়া না জানি সে জগৎটাকে কি রকম দেখে।

অনুবীক্ষণ দিয়া মাছিকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, যেখানে দেখিবে সেখানেই সূক্ষ্ম কৌশলের অদ্ভুত কাণ্ড। ঐ যে শুঁড়ের মতো তাহার জিভটি, সেও একটা কম আশ্চর্য ব্যাপার নয়। পাখার মতো ছড়ান জিনিসটি তাহার জিভের আগা। শিরার মতো জিনিসগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি নল। সেই নল দিয়া সে খাবার জিনিস চুষিয়া খায়। নলগুলি সমস্ত মিলিয়া গোড়ার দিকে মোটা চোঙার মতো হইয়াছে, সেই চোঙার ভিতর দিয়া খাবার জিনিস তাহার মুখের মধ্যে ঢুকিতে পায়। যদি আরও সূক্ষ্মভাবে খুব ভাল অনুবীক্ষণ দিয়া দেখ, দেখিবে প্রত্যেকটি নলের মধ্যে আবার আরও কত সূক্ষ্ম কারিকরি। এক-একটি নল যেন অসংখ্য আংটির মালা—আংটির উপর আংটি বসান, তাহাতে অসম্ভব রকম পাতলা চামড়ার ছাউনি। ঐ নলগুলার গায়ে দু'পাশে যে দুইটি কালো দাঁড়ার মতো দেখিতেছ, ঐ দুইটি গুটাইলে সমস্ত জিভটা ছাতার মতো গুটাইয়া যায়। জিভটা যখন মুখের ভিতর থাকে তখন তাহাকে এমনিভাবে গুটাইয়া মুড়িয়া রাখিতে হয়, আবার আহারের সময় দাঁড়া দুইটি নাড়া দিলেই নলগুলি মুহূর্তের মধ্যে ছড়াইয়া ঝাড়ের মতো ঝুলিয়া বাহির হয়। গরু বা ঘোড়ার গায়ে এক রকম বড় মাছি বসে, তাহাদের

ডাঁশ বলে। ডাঁশেরা রক্তপায়ী, সুতরাং তাহাদের জিভের সঙ্গে এক জোড়া করিয়া হুল থাকে। জিভটাও মাছির জিভের চাইতে অনেকখানি সরু—দেখিতে কতকটা বোতলের মতো। হুলের খোঁচায় জন্তুর গায়ে ফুটা করিয়া সেই ফুটার মধ্যে ইহারা জিভের আগাটুকু ঢুকাইয়া রক্তপান করে।

তারপর দেখ মাছির চরণখানি। ইহার মধ্যেও দেখিবার মতো জিনিস অনেক আছে। প্রথমেই চোখে পড়ে ঐ শিঙের মতো অদ্ভুত জিনিস দুইটি। কিন্তু বাস্তবিক দেখিবার মতো জিনিস চাও ত পায়ের ঐ উঁচু টিবলি দুইটিকে দেখ। ঐ দুইটি নরম তেলোর উপর ভর দিয়া মাছি আমাদের খাবারের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। খাবার জিনিসে যে পা ঠেকাইতে নাই, অন্তত পা-টাকে যে ভাল করিয়া সাবান দিয়া ধোয়া উচিত, সে খেয়াল ত মাছির নাই। সে অখাদ্য ময়লা জিনিসের উপর তিন জোড়া চরণ চাপাইয়া সেই চরণের ধূলি আবার আমাদের খাবারের উপর ঝাড়িয়া যায়। তাহার সঙ্গে কত যে রোগের বীজ চলিয়া আসে, তাহা ভাবিলেও ভয় করে। ঐ পায়ের তেলোটিকে অনুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে অনেক সময় দেখা যায় উহাতে সাংঘাতিক রোগের বীজ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে। সেইজন্য লোকে বলে মাছিকে খাবারের উপর বসিতে দিয়ো না। পায়ের তেলোটি আগাগোড়া বোলতার চাকের মতো অসমান—তাহার গায়ে অসংখ্য ছিদ্র—সেই ফুটা দিয়া সে যে-কোনো জিনিসকে চুষিয়া ধরিতে পারে। তাই কাচের মতো পালিশ জিনিসের উপরেও চলাফিরা করিতে তাহার কোনো অসুবিধা হয় না। দরকার হইলে ঐ ফুটাগুলির ভিতর হইতে সে এক রকম আঠাল রস বাহির করিতে পারে, তাহাতে পা আরও মজবুতভাবে আঁটিয়া বসাইবার সাহায্য হয়।

মাছি উড়িবার সময় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ছয় শত বার ডানা ঝাপটায়। খুব ব্যস্ত হইলে এক সেকেণ্ডে সে প্রায় বিশ-পঁচিশ হাত উড়িয়া যাইতে পারে। অতটুকু প্রাণীর পক্ষে ইহা বড় সামান্য কথা নয়। মাছিটাকে যদি একটা ঘোড়ার মতো কল্পনা করা যায় তাহা হইলে তাহার দৌড়টি হয় যেন কামানের গোলার মতো।

বাতাস ছাড়া মানুষ যেমন বাঁচে না—মাছিরও তেমনি নিশ্বাস না লইলে চলে না। আমরা নিশ্বাস লই ফুসফুসে বাতাস পাইবার জন্য। আমাদের বুকের দু'পাশে দুটি হাপরের মতো যন্ত্র আছে, তাহারই নাম ফুসফুস বা Lungs। ঐ ফুসফুসের মধ্যে বাতাস ঢুকিয়া শরীরের রক্তকে তাজা করিয়া তোলে। মাছির সমস্ত শরীরটাই যেন একটা প্রকাণ্ড ফুসফুস। তাহার শরীরের দু'পাশে ছোট ছোট ফুটা থাকে—সেইগুলিই তাহার নিশ্বাস লইবার ছিদ্র বা নাক। শরীরের ভিতরে সরু সরু শিরার মতো অসংখ্য প্যাঁচানো নল তাহার গায়ের রক্তের মধ্যে ডুবান রহিয়াছে। সেই নলের ভিতর দিয়া বাতাস চলে আর রক্ত তাজা হইয়া উঠে।

আমাদের যেমন অসুখ-বিসুখ আছে, মাছিরও তেমনি। এই এখন আম কাঁঠালের সময় এত মাছি দেখিতেছ, আর কিছুদিন পরেই তাহারা কমিতে আরম্ভ করিবে। এক রকম ছাতাপড়া ব্যারামে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মাছি মারা যায়।

মাছির কথা বলিতে গেলে তাহার জন্মের কথাও বলিতে হয়। আঁস্তাকুড়ের ময়লার মধ্যে বা

গোবরের গাদার মধ্যে মাছিরা ডিম পাড়িয়া যায়। খুব ছোট সাদা সাদা চালের মতো ডিমগুলি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে এক রকম পোকা বাহির হয়। সপ্তাহখানেক ধরিয়া এই পোকাগুলি অল্পে অল্পে বাড়িতে থাকে আর বার বার খোলস বদলায়। তারপর পোকাটা শুকাইয়া কেমন গুটি পাকাইয়া যায়—তাহাতে তামাটে রং ধরিয়া আসে। এইভাবে আরও কয়েকদিন থাকিলেই সেই গুটির ভিতর হইতে আস্ত মাছিটা বাহির হইয়া আসে। তারপর তাহার চেহারার আর কোনও পরিবর্তন হয় না। জন্মিবার সময় তার শরীরটি যতটুকু থাকে মরিবার সময়ও ঠিক ততটুকু। সাধারণত আমরা যেসব মাছি দেখি, তাহাদের ডিমগুলি দেখিতে নিতান্তই সাদাসিধা—তাহার গায়ে কোনো কারিকরি নাই। কিন্তু এক এক রকম মাছি আছে তাহারা অতি আশ্চর্য রকমের সুন্দর ডিম পাড়ে।

ছারপোকা এবং মশা কামড়াইতে জানে, মাছির সে বিদ্যা নাই। সেজন্য মানুষে ছারপোকা ও মশা তাড়াইতে যত ব্যস্ত হয়, মাছির ভয়ে ততটা ব্যস্ত হয় না। কিন্তু উৎপাত হিসাবে মাছিকে কাহারও চাইতে কম বলা চলে না। মেসোপটেমিয়ার যেখানে ইংরাজদের সহিত তুর্কীদের লড়াই চলিতেছে সেখানে গ্রীষ্মকাল আসিলেই মাছির উপদ্রব এমন সাংঘাতিক হইয়া উঠে যে, কেবল মাছি মারিবার জন্যই হাজার হাজার টাকা খরচ করিয়া নানা রকম কলা-কৌশল খাটাইতে হয়। মাছি যেখানে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঘুরিয়া বেড়ায় সেখানে কেবল হাতে মারিয়া তাহাদের কত শেষ করিবে? নানা রকম ফাঁদ পাতিয়া বিষাক্ত খাবারের লোভ দেখাইয়া একেবারে দলে দলে তাহাদের বংশকে বংশ উজাড় করিতে হয়। তা না হইলে সে-দেশে মানুষের তিষ্ঠান দায় হয়।

ফড়িং

ফড়িং পাওয়া যায় না, এমন দেশ খুব কমই আছে। যে-দেশে লতাপাতা আছে আর সবুজ মাঠ আছে, সে দেশেই ফড়িং পাওয়া যাবে। নানান্ দেশে নানান্ রকমের ফড়িং, তাদের রং এবং চেহারাও নানান্ রকমের; কিন্তু একটি বিষয়ে সবারই মধ্যে খুব মিল দেখা যায়, সেটি হচ্ছে লাফ দিয়ে চলা। এই বিদ্যায় ফড়িঙের একটু বিশেষ রকম বাহাদুরি দেখা যায়, কারণ অন্যান্য অনেক পোকার তুলনায় ফড়িঙের চেহারাটি বেশ বড়ই বলতে হবে। আরও অনেক বড় পোকা আছে, যেমন আরশুলা, যারা একটু-আধটু লাফাতে পারে; কিন্তু তাদের লাফানির চাইতে উড়বার ঝোঁকটাই বেশি। ফড়িঙের যদিও ডানা আছে, কিন্তু সেটা সে ঠিক উড়বার জন্য—অর্থাৎ বাতাস ঠেলে উঠবার জন্য—ব্যবহার করে না। তাতে কেবল লাফ দিবার সময় বাতাসে ভর করে শরীরটাকে কিছু হালকা করার সুবিধা হয় মাত্র। ফড়িঙের শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় যে, ঐরকম লাফ দিবার আয়োজন করেই তাকে গড়া হয়েছে। তার শরীরের ভিতরটা বাতাসে পোরা বললেও হয়—অন্য কোনো পোকার মধ্যে এতগুলো ফাঁপা নল প্রায়ই দেখা

যায় না। শরীরটা হালকা হওয়ায় যে লাফাবার সুবিধা হয় তা সহজেই বুঝতে পার। তার উপর ফড়িঙের পা দুটিতেও একটু বিশেষ রকমের কেরামতি আছে। পায়ের আগাটি যেন বঁড়শির মতো বাঁকান। লাফাবার সময় সে ঐ বঁড়শি দিয়ে সুবিধামতো গাছের ডালপালা কিছু-একটা বেশ করে আঁকড়িয়ে ধরে। তারপর পা-টাকে জোর করে গুটিয়ে হঠাৎ টান ছেড়ে দেয়, আর সেইসঙ্গে সমস্ত শরীরটা ধনুকের ছিলার মতো ছিট্‌কিয়ে যায়। এরকম সাংঘাতিকভাবে লাফাতে গিয়ে যাতে হাত পা জখম না হয়, তার জন্যও ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথম ব্যবস্থা, তার ডানা দুটি। লাফ দিয়ে পড়বার সময় ঐ ডানার উপর ভর দিয়ে সে লাফানির ঝুঁকিটা সামলিয়ে নেয়। তারপর সামনের পা-গুলোর আগায় যে পুঁটুলি রয়েছে ঐগুলোতে পড়বার চোট্‌ কমিয়ে দেয়। ফড়িঙের ইংরাজি নামটিতেও তার ঐ লাফানির পরিচয় পাওয়া যায় (Grass hopper অর্থাৎ 'যিনি ঘাসের উপর লাফিয়ে বেড়ান')।

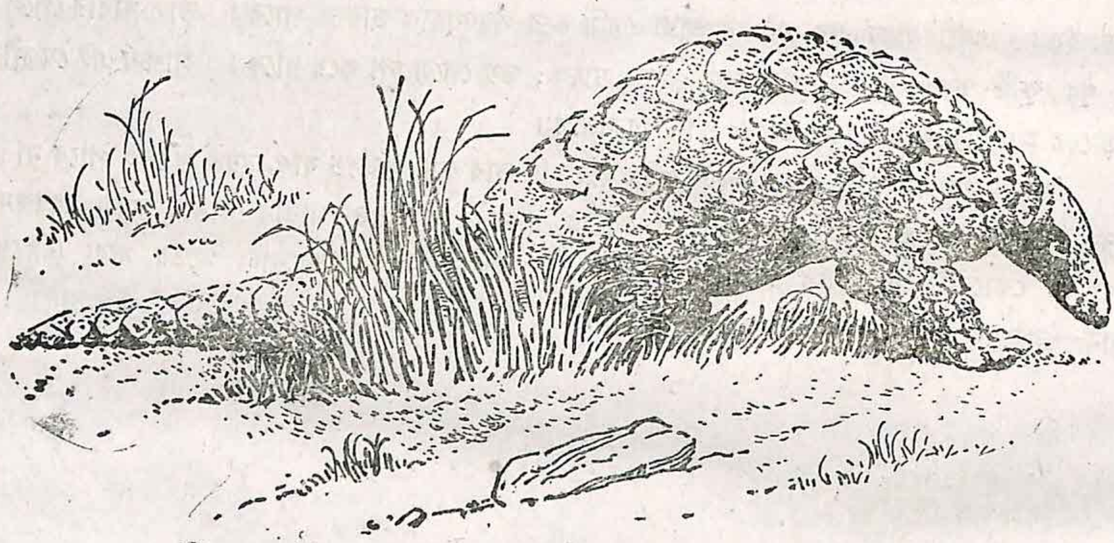
মাঠের মধ্যে ফড়িঙের 'চির্‌-চির্‌' শব্দ অনেক সময় খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এই আওয়াজটি তার গলা থেকে বেরোয় না—তার যন্ত্রটি থাকে ডানার মধ্যে। ডানা দুটির গোড়ায় 'উকার' মতো খড়্‌খড়ে দুটি সরু তারের উপর একটি পাতলা 'চামড়া'র ছাউনি। ঐ তারের ঘষাঘষিতে আওয়াজ হয় আর ওই পাতলা চামড়াটিতে সেই আওয়াজটিকে বাড়িয়ে তোলে। এই রকম আওয়াজ করে তাদের কি লাভ হয়? একটি লাভ হয় এই যে তারা এমনি করে পরস্পরকে ডাকতে পারে। ভাল খাবার পেলে বা খুব স্ফূর্তি হলেও তারা এই রকম করে ডাকে; ভয় পেলে চুপ করে থাকে। আশ্চর্য এই যে স্ত্রী ফড়িংদের আওয়াজ নাই; কিন্তু তাদের কান খুব সজাগ।

'কান' বললাম বটে, কিন্তু একটা ফড়িং ধরে যদি তার কান খুঁজতে যাও, হয়ত খুঁজেই পাবে না; কারণ, কানটি থাকে তার হাঁটুর কাছে না হয় পিঠের উপর। কানেরও আবার নানান্‌ রকম বেরকম আছে। কোনোটা একেবারে খোলা দুটো পাতলা চামড়ার উপর, কোনোটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে বসান—কোনোটার মুখে রীতিমতো ঢাকনি দেওয়া।

বর্মধারী জীব

কচ্ছপ কুমির আর সজারু, এই তিন বর্মধারী জন্তুকে বোধহয় তোমরা সকলেই দেখেছ। এদের তিন জনের বর্ম তিন রকমের। কচ্ছপের খোলাটা যেন তার জ্যান্ত বাসা—তার মধ্যে মুখ হাত পা গুটিয়ে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে তখন দুর্গের মতো বর্মটাকেই দেখতে পাই—বর্মধারী যিনি, তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যায় না। কুমিরের বর্মটা যথার্থই বর্ম, অন্য জন্তুর নখ দাঁতের অস্ত্র থেকে কেবল শরীরটাকে বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সজারুর বর্ম কেবল বর্ম নয়, সেটা একটা সাংঘাতিক অস্ত্রও বটে।

কচ্ছপ আর কুমিরের কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কিন্তু তাদের আশ্চর্য বয়সের কথা অনেকেই জান না। হাতির বয়সের কথা শুনতে পাই, তারা নাকি অনেক বৎসর বাঁচে। কিন্তু এই দুই জন্তু দু'শ আড়াই'শ বৎসর যে বাঁচে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, চার-পাঁচশ বৎসর পর্যন্ত তাদের বয়স হয়—একথা প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও বিশ্বাস করে থাকেন। এক ধরনের কচ্ছপকে বলে Giant Tortoise অর্থাৎ রাক্ষুসে কচ্ছপ। এরা এক-একটি তিন সাড়ে-তিন হাত পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আগে পৃথিবীর নানা জায়গায় এ রকমের কচ্ছপ পাওয়া যেত, কিন্তু পেটুক মানুষের অত্যাচারে তাদের বংশ এমনভাবে লোপ পেয়ে এসেছে যে এখন দু'একটি সমুদ্রের দ্বীপ ছাড়া এদের আর কোথাও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রকম এক রাক্ষুসে কচ্ছপকে মরিশাস্ দ্বীপে রাখা হয়েছে। সেই সময়ে তার বয়স যে খুব কম হলেও পঞ্চাশ বৎসর ছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই—সুতরাং এখন তার দু'শ বৎসর পার হয়ে গেছে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটা থুড়থুড়ে বুড়ো কচ্ছপ কয়েক বৎসর হ'ল মারা গিয়েছে—তার বয়স আরও অনেক বেশি হয়েছিল—কেউ কেউ বলেন ৪০০ বৎসরেরও বেশি। কুমিরও অনেকদিন বাঁচে—বয়স নিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে তার রেষারেষি হলে কে হারে কে জেতে সেকথা বলা শক্ত।



কুমিরের বর্মটি কতকগুলো চামড়ার চাকতি মাত্র। চামড়ার মধ্যে মোটা মোটা কড়া জমিয়ে বর্মটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু কচ্ছপের খোলাটি শুধু চামড়া নয়—মেরুদণ্ডের সঙ্গে পাঁজরের হাড় আর গায়ের চামড়া একসঙ্গে জুবড়িয়ে তাকে শিং-এর মতো মজবুত করে বর্মের এই অদ্ভুত সৃষ্টি হয়েছে। আর সজারুর বর্মটি তৈরি হয়েছে তার লোম দিয়ে। লোমের গুচ্ছ মোটা আর ধারাল হয়ে সাংঘাতিক কাঁটার বর্মটি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সজারুরা নিশাচর জন্তু। মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে তারা সারাদিন ঘুমিয়ে থাকে আর

রাত্তিরে বেরিয়ে ফল-মূল গাছের পাতা খেয়ে বেড়ায়। গর্তের মধ্যে নরম ঘাস আর কচি পাতা দিয়ে তারা বাসা বানায়। সজারুর যখন ছানা হয় তখন ছানার কাঁটাগুলো থাকে ঘাসের মতো নরম, কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই সেগুলো বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। সজারুর ল্যাজটা যেন একটা কাঁটার তোড়া, চলবার সময় তাতে খড়্‌মড়্‌ করে শব্দ হতে থাকে। কোনো কোনো সজারু খুব চটপট গাছে চড়তে পারে, তাদের ল্যাজ প্রায়ই খুব লম্বা হয়। আবার কোনো-কোনোটার কাঁটা বড় বড় লোমে ঢাকা।

কাঁটাওয়ালা জন্তু আরও অনেক আছে, কিন্তু সজারুর মতো এমন কাঁটার বাহার আর কারও নেই। অস্ট্রেলিয়ার একিড্‌না (Echidna) জন্তুটির একটুখানি চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এমন অদ্ভুত জানোয়ার সম্বন্ধে দু-একটা কথা না বললে নিতান্তই অন্যায় হবে। সাধারণ একিড্‌নাগুলো বেড়ালের চাইতে বড় হয় না ; কিন্তু 'ধাড়ি একিড্‌না' বা Proechidna আরও অনেকখানি বড় হয়—বেশ একটি ছোটখাটো ভালুকের মতো। অস্ট্রেলিয়ার প্লেটিপাস Platypus বা হংসচঞ্চুর মতো এরাও স্তন্যপায়ী অথচ ডিম পাড়ে—ডিম ফুটে যে ছানা বেরোয় তারা মায়ের দুধ খায়। এই জন্তুর শরীরটি ছোট ছোট কাঁটায় ভরা—ছোট ছোট কিন্তু খুব শক্ত আর ধারাল। মুখখানা ওরকম অদ্ভুত ছুঁচোল হবার কারণ এই যে এরা পিঁপড়ে-খোর। চোঙার মতো মুখ, তার মধ্যে একটিও দাঁত নেই—আছে খালি একটি প্রকাণ্ড সরু জিভ—তাই দিয়ে লক্‌লক্‌ করে পিঁপড়ে চেটে খায়। সজারুর মতো এরাও নিশাচর—তাই দিনের বেলায় গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকে।

পিঁপড়ে-খোর জন্তুদের অনেকেরই মুখ ঐ চোঙার মতো কিন্তু সকলের গায়ে বর্ম নেই। যাদের গায়ে বর্ম আছে, তাদের নাম প্যাঙ্গোলিন (Pangolin)। এই জন্তুর বর্মের গড়ন ভারি অদ্ভুত ; শিং-এর মতো মজবুত চাকতি, সমস্তটি গায়ের উপর মাছের আঁশের মতো সাজান। পায়ের নখগুলি সাংঘাতিক মজবুত—তাই দিয়ে আঁচড়িয়ে তারা উইয়ের ঢিপি আর পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফাঁক করে ফেলে। তারপর জিভ দিয়ে টপাটপ উই পিঁপড়ে চেটে খায়। হঠাৎ তাড়া করলে বা ভয় পেলে এরা ডিগবাজি খেয়ে ফুটবলের মতো গোল পাকিয়ে যায়। এদের গায়ের ধারাল আঁশগুলি তখন চারিদিকে খাড়া হয়ে ওঠে। দক্ষিণ আমেরিকার আরমাডিলো এ বিষয়ে আরো ওস্তাদ। সে যখন হাত-পা গুটিয়ে শরীরটিকে লাড়ু পাকিয়ে ফেলে তখন কোথায় মুখ কোথায় হাত-পা কিছুই বুঝবার জো থাকে না। তার বর্মের গড়নটি মাছের আঁশের মতো নয়—চিংড়ি মাছের খোলার মতো।

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আরও অনেক জন্তুরই নাম করতে হয়। শামুক ঝিনুক প্রবাল হতে আরম্ভ করে কাঁকড়া চিংড়ি বিচ্ছু, এমনকি মাছ গিরগিটি পর্যন্ত প্রাণের দায়ে কত দেশে কত রকম বর্ম এঁটে ফেরে তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। হাজার রকম জীবজন্তু, তারা সবাই যখন বাঁচতে চায় তখন বাঁচবার উপায়ও তাদের করতে হয়। বাঁচবার উপায় তিন রকম। এক হচ্ছে গায়ের জোরে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রবল হয়ে শত্রুকে মেরে বাঁচা ; আর এক হচ্ছে দৌড়ের জোরে বা কলা-কৌশলে পালিয়ে আর লুকিয়ে বাঁচা ; আর তৃতীয়টি হচ্ছে শরীরটিকে এমন জবরদস্ত করা যে, মারধর অত্যাচারের চোট সে সয়ে থাকতে পারে। বর্মধারী জীবেরা এই শেষ উপায়টিকে বাগাবার চেষ্টায় আছেন। এতে এক-একজন যে অনেকখানি ওস্তাদি দেখিয়েছেন তাতে সন্দেহ কি ?

লড়াইবাজ জানোয়ার

এক-একজন মানুষ থাকে—কেবল সকলের সঙ্গে ঝগড়া বাধানো হচ্ছে তাদের স্বভাব। কথায় কথায় যেমন তাদের মুখ চলে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হাতও চলে। জানোয়ারদের মধ্যেও এই রকম বদমেজাজী জীবের অভাব নেই। যেসব বড় বড় জন্তু পেটের দায়ে অন্য জন্তু শিকার করে বেড়ায়, আমরা তাদের বলি শ্বাপদ জন্তু, হিংস্র জন্তু। কিন্তু মানুষ যখন নিরীহ ছাগল ভেড়া বা হাঁস মোরগের গলায় ছুরি মেরে তাদের মাংস কেটে খায় তখন আমাদের মনেই হয় না যে আমরাও ঐ হিংস্র জন্তুর দলে। জানোয়ারদের

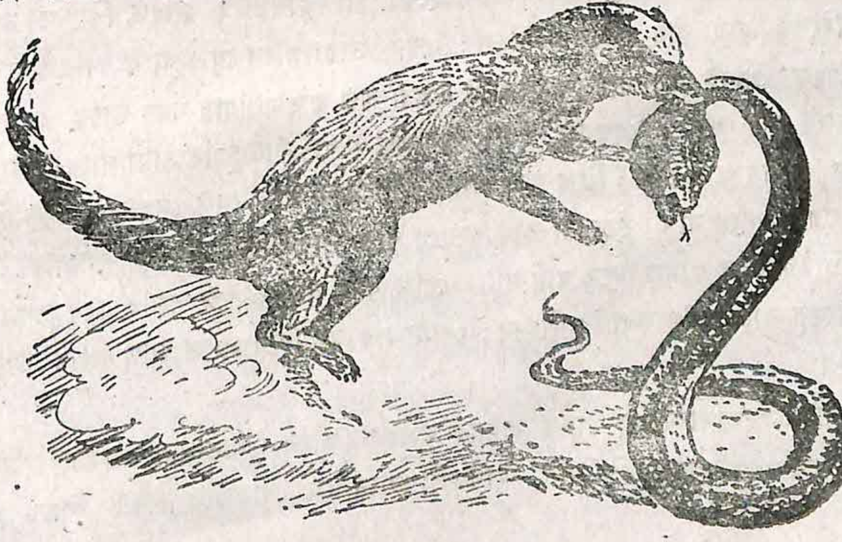


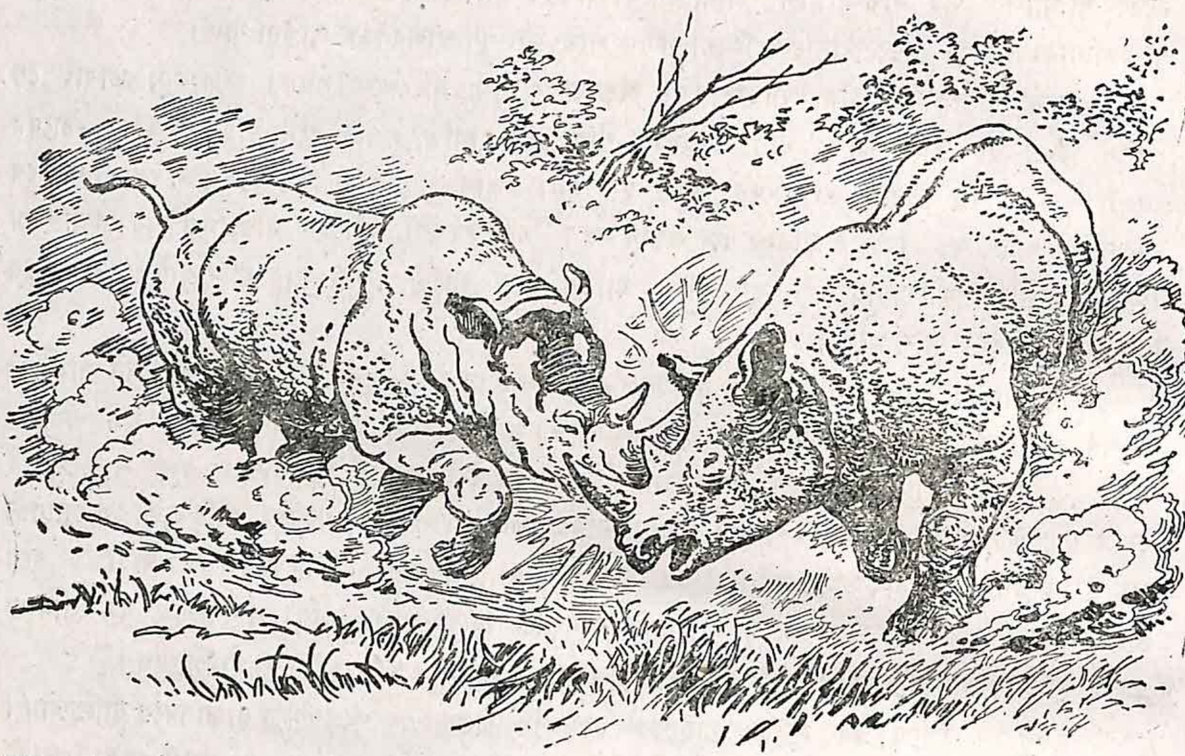
মতো সাংঘাতিক নখ দাঁত বা শিং আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু তার বদলে যেসব ধারাল অস্ত্র আমরা ব্যবহার করি তাতে আমাদের হিংসা-বৃত্তির পরিচয়টা খুব ভালরকমই পাওয়া যায়।

জানোয়ারদের মধ্যে যারা আমিষভোজী, অন্য জন্তুর মাংস না খেলে যাদের চলে না, তারাই যে কেবল হিংস্র হয় তাও নয়। যারা নিরামিষ খায়, যেমন হাতি, গণ্ডার, বুনো মহিষ বা বরাহ—তাদের মেজাজও সব সময় নিরীহ তপস্বীদের মতো হয় না। আর সে মেজাজ বিগড়ালে বেশ বোঝা যায় যে সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে তারাও কম ওস্তাদ নয়। মহিষের শিং, বরাহের দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ অস্ত্র হিসাবে এগুলি কোনোটাই বড় কম নয়। হাতির দাঁত আছে—কিন্তু তার চাইতে ঐ গোদা পায়ের চাপুনিটাই বোধহয় বেশি মারাত্মক।

ছোটখাটো জন্তুদের আমরা হিংস্র জন্তু বলে বড় একটা গ্রাহ্য করি না, কারণ, তাদের দিয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাদের সমান জন্তুদের কাছে তারাও বড় কম ভয়ানক নয়। এমন যে নিরীহ কাঠবেড়ালী, যে সারাদিন অন্য-জন্তুর ভয়ে ভয়ে থাকে, কোথাও একটু শব্দ পেলেই চমকিয়ে ছুটে পালায়, ছোট ছোট পাখির বাসায় ডিমের সন্ধান পেলে সেও একজন রীতিমতো অত্যাচারী হয়ে উঠতে জানে। হঠাৎ তাড়া খেলে বা ভয় পেলে ইঁদুর বা ছুঁচোর মতো ছোট জন্তুও বেশ মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। সেরকম অবস্থায় তারা মানুষকেও কামড়াতে ছাড়ে না। আর সে-কামড়ও বড় সামান্য নয়। ছুঁচোর কামড় খেয়ে মানুষকে কখনও কখনও মাসের পর মাস জ্বরে ভুগতে দেখা গিয়েছে।

কিছুদিন আগে এক সাহেব সাইকেল চড়ে বিলাতের এক পাড়াগেঁয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যার সময় পথের মাঝে নেমে তিনি সাইকেলের আলো জ্বালাচ্ছেন, এমন সময় ছোট্ট একটা বিলাতী বেজি ঘুরতে ঘুরতে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত। সাহেবের কি খেয়াল হ'ল, তিনি রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে বেজিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন। মারতেই বেজিটা অদ্ভুত কিচমিচ শব্দ করে উঠল; আর তাই শুনে কোত্থেকে বারো-চোদ্দোটা বেজি এসে একসঙ্গে সাহেবকে আক্রমণ করে বসল। তারা ক্রমাগত লাফ দিয়ে সাহেবের গলার টুঁটি কামড়ে ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব একটুক্ষণ





আত্মরক্ষার চেষ্টা করে তারপর প্রাণের ভয়ে সাইকেল চড়ে সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেজিগুলো তবু প্রায় দেড় মাইল পথ সাইকেলের পিছন পিছন তাড়া করে এসেছিল। হঠাৎ কি করে যে বেজিদের এতখানি তেজ আর সাহস হয়ে উঠল তার কোনও কারণ পাওয়া যায় না; কারণ, সাধারণতঃ তারা মানুষের শব্দ পেলেই ছুটে পালায়।

বেজিগুলো ইচ্ছা করলে খুব সহজেই সাহেবের পা কামড়াতে পারত, কিন্তু তা না করে তারা গলার টুঁটির দিকেই বার বার তেড়ে উঠছিল; যেন তারা জানে যে ঐখানে কামড়ালে জখমটা হবে সাংঘাতিক। এরকম প্রায়ই দেখা যায় যে শিকারী জন্তুরা অন্য জন্তু মারবার সময় তাকে এমনভাবে মারে যাতে সে সহজেই কাবু হয়। 'হেজহগ' (Hedgehog) বা কাঁটাচুয়ার সারা গায়ে কাঁটা, তার গায়ে কোথাও কামড় দেবার জো নেই; কিন্তু তার গলার নীচেটাতে কাঁটা নেই, সেখানে কামড় দিলে বেচারা আর আত্মরক্ষা করতে পারে না। ইঁদুরেরা তাই সুযোগ বুঝে তার গলায় কামড় বসাবার চেষ্টা করে; ভুলেও কখনও পিঠের উপর কামড় দিতে যায় না। বেজি যখন সাপের সঙ্গে লড়াই করে তখন তার দৃষ্টি থাকে সাপের ঘাড়ের কাছে, ঠিক ফণাটির পিছনে; সেখানে কামড় দিয়ে ধরলে সাপ আর উলটে ছোবল মারতে পারে না।

ছোট ছোট পোকামাকড়েরা পর্যন্ত এইসব সংকেত জানে। তোমরা বোলতা আর মাকড়সার লড়াই দেখেছ? সে এক অদ্ভুত জিনিস। মাকড়সা জানে যে বোলতার একটি কামড় খেলে তার

আর রক্ষা নেই, তাই সে কেবলই জালের আড়াল দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। সেই জালের ভিতর থেকে সবগুলি পা একসঙ্গে বার করে সে বোলতাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কখনও তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করবার সাহস পায় না। বোলতাও বার বার ভন্ ভন্ করে জালের কাছে পর্যন্ত তেড়ে এসে আবার পালিয়ে যায়, কারণ, সেও জানে যে ওই জালের মধ্যে একবার আটকা পড়লে তার আর বের হবার উপায় নেই।

কেবল যে অন্য জন্তুদের সঙ্গেই জানোয়ারদের লড়াই বাধে, তা নয়। ছাগলের লড়াই বেড়ালের ঝগড়া কিংবা কুকুরের কামড়াকামড়ি তোমরা সকলেই দেখেছ। কাকে-কাকে কিংবা চড়াইয়ে-চড়াইয়ে ঝগড়াও সর্বদাই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের ঘরে একটা ধাড়ি টিকটিকি আছে, সন্ধ্যার পর দেওয়ালের বাতির কাছে যেসব পোকা বসে সে তাদের ধরে ধরে খায়। অন্য টিকটিকিকে ঘরের ত্রিসীমানার মধ্যে আসতে দেখলে সে তাকে তাড়া করে যায়, পাছে সে এসে তার খাবারে ভাগ বসায়। খাবারের জন্যে জানোয়ারদের মধ্যে রেষারেষি ত চলেই, বিয়ের জন্যেও রেষারেষি চলে। মনে কর, জঙ্গলে একজন পরমাসুন্দরী গণ্ডারনী আছেন আর দুটি ছোকরা গণ্ডার আছে, তাদের দু'জনেরই তাকে ভারি পছন্দ। এখন উপায় ? উপায় হচ্ছে দস্তুরমতো লড়াই করে এর মীমাংসা করে নেওয়া। এরকম লড়াই হরিণদের মধ্যেও চলে, অন্যান্য অনেক জন্তুর মধ্যেও চলে। পাখিদের মধ্যেও খুবই চলে।

এ ছাড়া এমন অনেক জন্তু আছে যারা কেবল লড়াইয়ের খাতিরেই লড়ে। যেসব দলছাড়া হাতি একলা একলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, তাদের স্বভাবটা অনেক সময়েই এই রকম হয়। বুনো বরাহদের স্বভাবটাও নাকি অনেকটা এই ধরনের। আর এক রকম ভিমরুলের কথা আমি জানি, সে থাকে খাসিয়া পাহাড়ে, তার গায়ে ডোরা ডোরা দাগ ; তাকে কিছু না বললেও সে তেড়ে এসে বঁড়শির মতো হুল দিয়ে কামড় বসিয়ে দেয়। আমার মাথায় ভাল করে কামড়াতে পারেনি, তবুও তিনদিন ব্যথার চোটে আমার ঘুমান মুশকিল হয়েছিল।

নিশাচর

নিশাচর বলে তাদের যারা রাত জেগে চলাফেরা করে, অর্থাৎ আহার খোঁজে। নিশাচর জন্তুদের মধ্যে একটির নাম তোমরা সকলেই বলতে পারবে, সেটি হচ্ছে 'প্যাঁচা'।

নিশাচরেরা রাত্রে আহার করে কেন ? তার নানা কারণ আছে। প্রথমত যারা শত্রুর ভয়ে দিনের আলোতে বেরুতে সাহস পায় না, রাত্রে অন্ধকারে তাদের গা ঢাকা দিয়ে চলবার সুবিধা হয়। যেমন আফ্রিকার 'কাকাপো' অথবা 'প্যাঁচাটিয়া'। এদের ডানা ছোট বলে ভাল করে উড়তে পারে না ; দিনের বেলা বেরোলেই অন্য পাখিরা ঠুক্‌রিয়ে অস্থির করে তোলে। ইঁদুর জাতীয় নানা রকম নিরীহ

জন্তু আছে, তারাও এক রকম শত্রুর ভয়ে সারাদিন লুকিয়ে থাকে, রাত্রে শিকারের খোঁজে বেরোয়।

কোনো কোনো জন্তু আছে তাদের শরীরের গঠন এমন যে তারা দিনের আলো, রোদ বা গরম সইতে পারে না। প্যাঁচার চোখ এমন অদ্ভুত যে সে আলোর দিকে ভাল করে তাকাতেই পারে না, সহজেই চোখ ঝলসে যায়। সাপ ব্যাঙ প্রভৃতি যেসব জন্তুর রক্ত ঠাণ্ডা, তারা রোদে বেরোলে শরীরের রস শুকিয়ে যায়, তাই তারা সারাদিন ঝোপে জঙ্গলে ছায়ার মধ্যে থাকতে চায়।



আর একদল নিশাচর আছে, যারা রাত্রে বেরোয় ভাল রকম শিকার জোটে বলে। বাঘ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় মাংস-খোর জন্তুরা এই কারণেই অনেক সময় নিশাচর হয়। সন্ধ্যার পর নানা রকম পোকামাকড় বেরোয়, তাই পোকা-খোর জন্তুরাও ঐ সময়ই খাবার আশায় ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় যে চামচিকারা বা নাকাটি পাখিরা ত্রস্ত হয়ে আকাশময় ছুটাছুটি করে, সেটাও তাদের ভোজের আনন্দ। ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে তারা উড়তে উড়তে পোকা ফড়িং খেয়ে বেড়াচ্ছে।

'লেমার' বা ক্ষুদে বানরদেরও অনেকেই এই দলের মধ্যে পড়ে। তারাও রাত হলেই পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায়। রাত্রে আলোর কাছে টিকটিকির পোকা শিকারের উৎসাহ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। রাত্রে আলো দেখে যত পোকা এসে জড়ো হয় দিনের বেলায় একসঙ্গে তত পোকা পাওয়া শক্ত। টিকটিকির ভোজটাও তাই সন্ধ্যার পরে জমে ভাল।

নিশাচর জন্তুদের প্রায় সকলের মধ্যেই একটি অভ্যাস দেখা যায়—সেটি হচ্ছে নিঃশব্দে চলা। প্যাঁচার শরীরটি ত নেহাৎ ছোট নয়, সে উড়তেও পারে বেশ ; অথচ উড়বার সময় তার ডানা ঝাপ্টার শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। রাত্রে অন্ধকারে দেখতে হয় বলে তাদের চোখ দুটোও তেমনি করে তৈরী। প্রায়ই দেখা যায় নিশাচর জন্তুদের চোখ প্যাঁচার মতো বড় আর গোল-গোল হয়। সেই জন্যে অনেক সময় তাদের দেখতেও অদ্ভুত দেখায়। যেসব ক্ষুদে বানরের কথা বলেছি, তাদেরও চোখ মুখ আর চলাফেরা এমন অদ্ভুত গোছের হয় যে দেখলে অনেক সময় ভয় হয়। আরেক রকম বানর আছে, তার

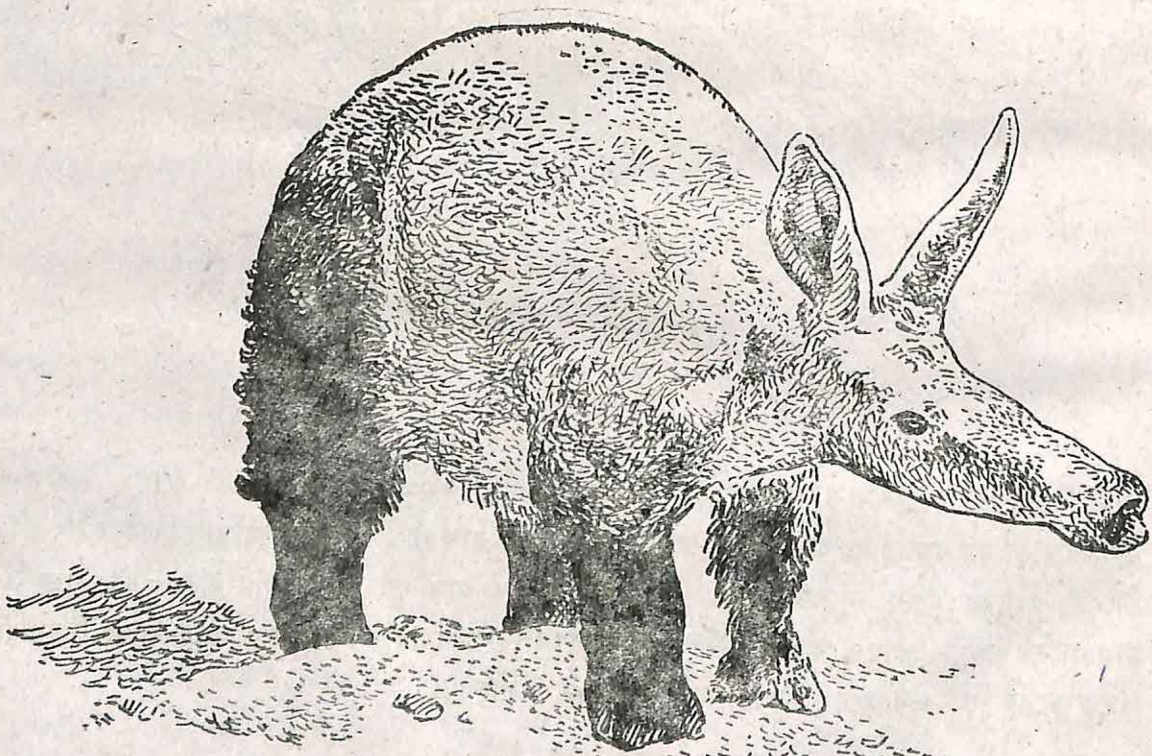


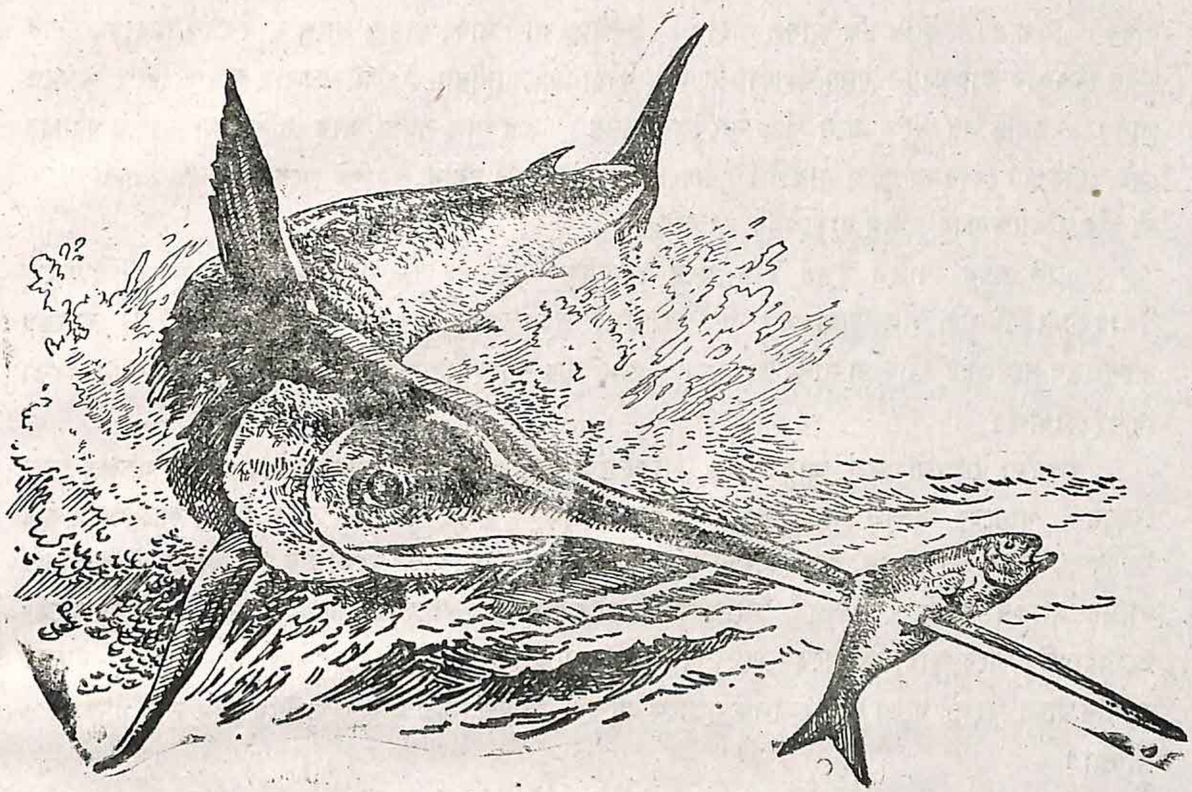
নাম 'টার্সীয়ের'। যে-দেশে এর বাড়ি সেখানকার লোকেরা একে 'ভূত বানর' বলে। এর সমস্ত কপালজোড়া বড় বড় চোখ, আর রোগা রোগা কাঠির মতো হাত পা। গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ উঁকি মেরেই রবারের মতো নিঃশব্দে লাফ দিয়ে আবার দশ হাত দূর থেকে উঁকি মারা—এই হচ্ছে এর চালচলনের ধরন। কারও কোনো অনিষ্ট করে না, কেবল পোকামাকড় খেয়ে থাকে অথচ লোকে মিছামিছি তাকে ভূতের মতো ভয় করে। তবে একটা কারণ সে নিশাচর।

আমাদের পুরাণে রাক্ষসদের নামও নিশাচর। তারাও নাকি দিনের আলোর চাইতে রাত্রের অন্ধকারটাই বেশি পছন্দ করে। আর চোর ডাকাত যারা পরের বাড়িতে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত মানুষের সর্বনাশ করে, তাদেরও 'শিকার' করবার সুবিধা হয় রাত্রে। আজকালকার সভ্য মানুষ রাতকে দিন করে রাখে। রাত্রেও হাজার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তার কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার চালাতে হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে ভদ্র মানুষকেও কাজকর্মের জন্য নিশাচর হতে হয়। ভোরবেলা যে খবরের কাগজটি পড় তার জন্যে যে কত লোকের রাত জেগে খাটতে হয় তা কখনও ভেবে দেখেছ কি ? আর রেলে ষ্টীমারে ড্রাইভার, গার্ড প্রভৃতি কতজনকে যে দিনের পর দিন রাতমজুরি খাটতে হয়, তারাও একরকম নিশাচর বৈকি !

নাকের বাহার

মানুষের নাকের প্রশংসা করতে হলে তিল ফুলের সঙ্গে, টিয়া পাখির ঠোঁটের সঙ্গে, গরুড়ের নাকের সঙ্গে তার তুলনা করে। কেউ কেউ আবার বলেন শুনেছি, 'বাঁশির মতো নাক', কিন্তু মোটের উপর এ-কথা বলা যায় যে, সকলের নাকেরই মোটামুটি ছাঁদটি সেই একঘেয়ে রকমের ; দো-নলা সুড়ঙ্গের মতো। কারো নল দুটি সরু, কারো বা মোটা, কারো চ্যাপ্টা, কারো উঁচু—কারো মাঝখানে ঢালু, কারো আগাগোড়াই ঢিপি এই রকম সামান্য উনিশ-বিশ যা একটু তফাৎ হয়। কারো কারো নাক যদি হাতির





তলোয়ার মাছ

শুঁড়ের মতো লম্বা হ'ত কি গণ্ডারের মতো খড়্গধারী হ'ত, অথবা আর কোনো উদ্ভট জানোয়ারের মতো হ'ত, তাহলে বেশ একটু রকমারি হতে পারত।

হাতির শুঁড়টাই যে তার নাক এ-কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। হাতির পরেই যে জন্তুটির নাম করা যায়, তার নাম টেপির ; এর নাকটিও শুঁড় হতে চেয়েছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। তার পরেই মনে পড়ে পিঁপড়ে-খোরের কথা, এরও একটা শুঁড় আছে কিন্তু সেটা শুধু নাক নয়, নাক মুখ দুই মিলে লম্বা হয়ে ওরকম হয়ে গেছে। কুমিরেরও ঠিক তাই। আর একটি আছে চোঙামুখ। তারপর দু'রকমের ছুঁচো আছে, তার একটির বেশ স্পষ্টরকম শুঁড় গজিয়েছে, আর একটি কেবল শুঁড়ে সন্তুষ্ট নয়, তার নাকের আগাটি হয়েছে ঠিক ফুলের মতো। এই সৌখিন ছুঁচোটির গায়ের গন্ধ কিন্তু ফুলের মতো একেবারেই নয়। তার চেয়ে জমকালো নাকের কথা যদি বলতে হয় তবে পুষ্পনাসা বাদুড়ের কথাটা নিতান্তই বলা উচিত। পর্দার পর পর্দা গোলাপফুলের পাপড়ির মতো সাজিয়ে তার উপরে যেন তিলক-চন্দন এঁকে নাকটিকে তৈরি করা হয়েছে। এত ঘটা করে নাকের বাহার ফোটাবার উদ্দেশ্যটা কি, মুখের 'সৌন্দর্য' বাড়ান না শত্রুকে ভয় দেখান, তা আমি জানি না।

পুষ্পনাসার পরে আসে হংসচঞ্চু, তার নাকমুখ হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপটা। আর রয়েছে ম্যানড্রিল

বাঁদর। এর রংটিই হচ্ছে এর আসল বাহার। টক্‌টকে লাল নাক, তার দু-পাশে নীলরঙের ঢিব্‌লি, তার উপর চমৎকার কারুকার্য—যারা কলকাতায় আছ তারা চিড়িয়াখানায় গেলেই একবার স্বচক্ষে দেখে আসতে পার। ম্যানড্রিলের সঙ্গে মনে পড়ে নাকেশ্বর বানর। এর নাক সম্বন্ধে আর বেশি কথা বলবার দরকার নেই, ছোটখাট বেগুনের মতো নাকটি। বাঁদরের খাঁদা নাকের দুর্নাম সকলেই করে কিন্তু এই নাকটি খাঁদা না হলেও তাতে তার সুনাম বাড়বে কি না সন্দেহ।

ব্যাঙ যখন হাতির উপর রাগ করে বলেছিল "বড় যে ডিঙোলি মোরে"—তখন হাতি তাকে "থ্যাব্‌ড়ানাকী" বলে গাল দিয়েছিল। হাতির গালটা খুব লাগসই হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্যাঙের বংশেও যে সকলেরই থ্যাব্‌ড়া নাক, তা নয়। এমন ব্যাঙ আছে যাদের নাকটি চড়াই পাখির ঠোঁটের মতো দিব্যি চোখাল।

কোনো কোনো জন্তু আবার শুধু নাকটাকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তারা নাকের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র জুড়ে বেড়ায়। গণ্ডারের খড়্গটি থাকে তার নাকের উপরে। আফ্রিকায় এক রকম বরাহ আছে তার নাম বাবিরুসা, তার নাকের দু'পাশে চামড়া ফুঁড়ে দুই জোড়া দাঁত শিঙের মতো উঁচু হয়ে থাকে। তলোয়ার মাছের নাকের ডগায় যে অস্ত্রটি বসান থাকে তাতে বাস্তবিকই তলোয়ারের কাজ হয়। করাতি মাছের তলোয়ারটির গায়ে আবার করাতের মতো দাঁত কাটা থাকে। বঁড়শিবাজ মাছের কথা শুনেছ—তারা নাকের আগায় বাঁকা ছিপের মতো লম্বা নোলক ঝুলিয়ে রাখে। উদ্দেশ্য, অন্য মাছকে ভুলিয়ে এনে তার ঘাড় ভেঙে খাওয়া।

কোনো কোনো জন্তুর নাকটা যে কোথায় সেটা হঠাৎ খুঁজে পাওয়াই শক্ত। তিমি মাছের মাথার উপর যেখানে তার চোখ থাকবার সম্ভাবনা মনে হয় সেখানে তার নাক থাকে। কাঁটাল গিরগিটির গা-ভরা এবড়ো-খেবড়ো শিঙের মতো কাঁটার ঝোপ—তার মধ্যে তার নাক মুখ চোখ অনেক সময়েই বেমালুম লুকিয়ে থাকে। আর হাতুড়িমুখো হাঙরের চেহারা ত আগাগোড়াই উল্টারকম। একটা দু'মুখো হাতুড়ির মতো তার মাথা, সেই হাতুড়ির দুই মাথায় দুটি চোখ। আর নাকটা হচ্ছে হাতুড়ির মাঝামাঝি—হাতুড়ির ডাণ্ডাটা যেখানে বসান থাকে সেইখানে।

এখন তোমরা বল, এর মধ্যে কার নাকের বাহার বেশি।

জানোয়ারের প্রবাস যাত্রা

গ্রীষ্ম আসিতেছে—তোমরা কতজনে হয়ত এখন হইতেই তাহার কথা ভাবিতেছ। কবে ছুটি হইবে, তারপর কে কোথায় যাইবে, কেমন করিয়া সময় কাটাইবে ইত্যাদি কত কথা। গ্রীষ্মের সময়ে যে দেশে গরম কম সেই দেশে যাইতে ইচ্ছা করে, তাই লোকে সিমলা যায় দার্জিলিং যায় শিলং যায়। এরকমে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার ইচ্ছা কেবল যে আমাদেরই হয় তাহা নয়, পশুপক্ষী সকলেরই মধ্যে কিছু কিছু দেখা যায়।

শীতের দেশের পাখি যাহারা হিমালয়ের উত্তরে সারা বছর কাটায়, তাহারা প্রতি বছর শীতকালে আমাদেরই গরম দেশে হাওয়া খাইতে আসে। কোথায় হিমালয় আর কোথায় এই বাংলাদেশের দক্ষিণ; অথচ বছরের পর বছর কত হাঁস কত বক এই লম্বা পথ পার হইয়া আসে, আবার শীতের শেষে ঠিক নিয়মমতো সময়ে হিমালয় ডিঙাইয়া দেশে ফিরিয়া যায়। কোথা হইতে যে তাহারা এ দেশের সন্ধান পায়, আর কেমন করিয়াই বা এতখানি পথ চিনিয়া আসে, তাহা কে বলিতে পারে? এরকম যাওয়া-আসা পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। গরম দেশের পাখি গ্রীষ্মের ভয়ে ঠাণ্ডা দেশে চলিয়াছে; আবার ঠাণ্ডা দেশের পাখি শীতের তাড়ায় গরম দেশে শীতকাল কাটাইতেছে। আশ্চর্য এই যে, এ সকল পাখি এমন ভরসার সঙ্গে হিসাবমতো চলাফিরা করে যে, মনে হয় যেন পথঘাট সবই তার জানা আছে। যেখানে পথঘাটের কোনো চিহ্ন নাই, রাস্তা চিনিবার কোনো উপায়ও নাই, সেই অকুল সমুদ্রের মধ্যে দিয়াও তাহারা নির্ভয়ে পথ বুঝিয়া চলে। মেঘ বৃষ্টি কুয়াশায় অন্ধকারে কিছুতেই তাহারা পথ ভুলে না। এইরূপে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখি মাস ঋতুর হিসাব রাখিয়া আকাশে পাড়ি দিয়া ফিরে।

এ ত গেল পাখির কথা। বড় বড় ডাঙার জন্তুও যে এইরূপে দল বাঁধিয়া প্রবাস যাত্রা করে, এরকম ত কত সময়েই দেখা যায়। জেব্রা জিরাফ হাতি হরিণ বুনো মহিষ ইহারা সকলেই সময়মতো এ-বন ও-বন ঘুরিয়া বেড়ায়। আমেরিকার বাইসনগুলি যখন শীতের সময় বড় বড় দেশ পার হইয়া সবুজ বন আর তাজা ঘাসের সন্ধানে যাত্রা করে, তখন তাহারা একেবারে মাইলকে মাইল পথ জুড়িয়া চলে। এক সময়ে এই বাইসনের চলাফিরা আমেরিকায় সহজেই দেখা যাইত কিন্তু নানা কারণে এখন বাইসনের সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে মানুষের অত্যাচার খুব একটা বড় কারণ বলিতে হইবে। যখন বড় বড় দল গোঁ-ভরে নদীজল ভাঙিয়া মাঠ ঘাট পার হইতে থাকে তখন যাহারা দুর্বল, যাহারা চলিতে পারে না, তাহাদের অনেকে পিছে পড়িয়া যায়। সেই সময়ে নানা রকম মাংসাশী জন্তু আসিয়া তাহাদের মারিয়া শেষ করে। কিন্তু তবু মানুষে অত্যাচার না করিলে এখনও তাহারা লাখে লাখে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত।

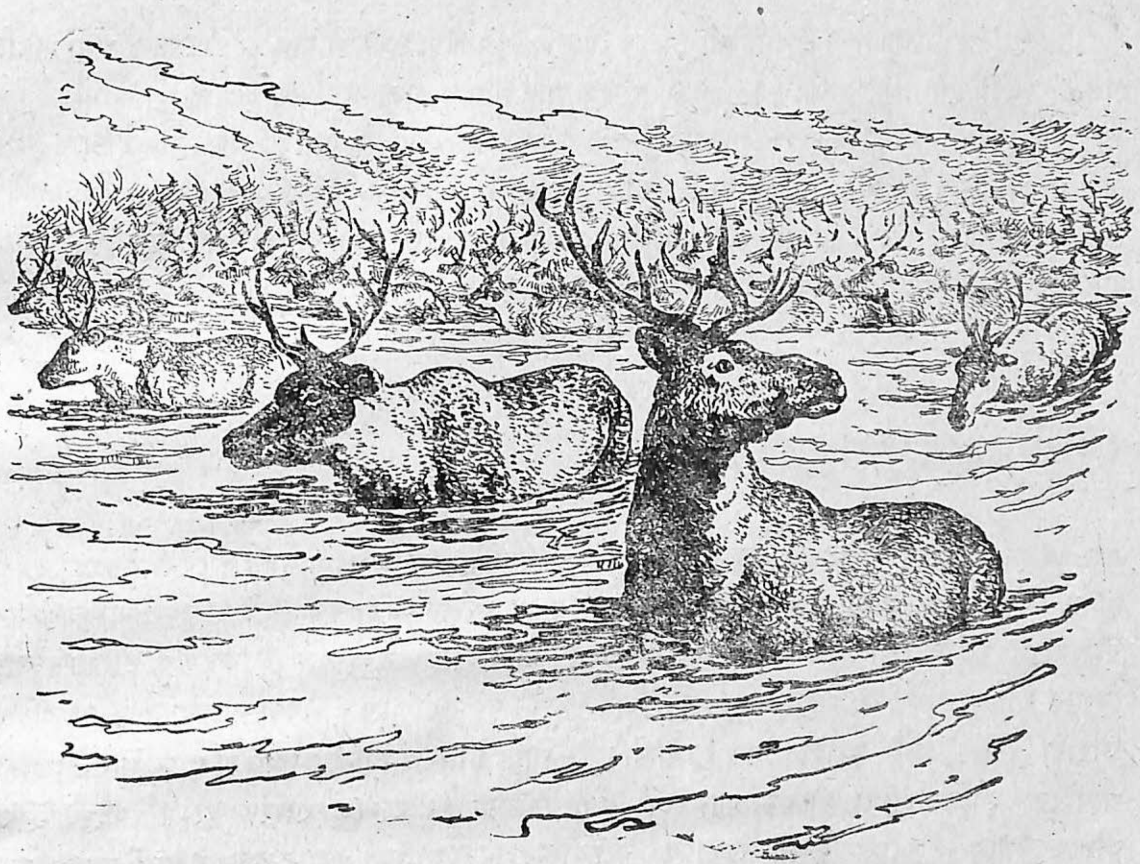
মানুষ কয় বৎসর সেখানে বসবাস না করিতেই পঞ্চাশ লক্ষ বাইসন খাইয়া হজম করিয়াছে। এক-এক দল লোক এক-এক বারে দশ বিশ হাজার বাইসন মারিয়া তবে ছাড়ে।

হাতিরা দল বাঁধিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় এরূপ অনেক সময়েই দেখা যায় কিন্তু সেটা কেবল খাবার সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র। দেশ ছাড়িয়া লম্বা দৌড় দেওয়ার অভ্যাসটা তাহার নাই। অর্থাৎ আজকাল তাই। হাতির যাহারা পূর্বপুরুষ, তাহারা যে দেশ-বিদেশ বিচরণ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই, তাহার ঢের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইংলণ্ড বল, আমেরিকা বল, গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা বল, আর শীতপ্রধান সাইবেরিয়া বল, সকল স্থানেই জীবন্ত হাতি না পাও, হস্তীজাতীয় জন্তুর কঙ্কাল-চিহ্ন পাইবে। আফ্রিকার উত্তরদিকে ইজিপ্টের মধ্যে বহু পুরাতন একটা শূকরের মতো জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, পণ্ডিতেরা বলেন সেই নাকি হাতির একজন পূর্বপুরুষ। বিদেশ ভ্রমণ কাহাকে বলে তাহা এই জানোয়ারের বংশধরেরা খুব ভাল করিয়াই দেখাইয়া গিয়াছে। হাতির কথা বলিতে গেলে আপনা হইতেই ঘোড়ার কথা মনে আসে। হাতির মতো ঘোড়াও, অর্থাৎ তাহার পূর্বপুরুষও এক সময়ে পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সে ঘোড়া আর আজকালকার মানুষের পোষা ঘোড়ায় আকাশ-পাতাল তফাৎ—ঠিক যেমন নেকড়ে বাঘ আর সৌখিন কুকুরের প্রভেদ।

হরিণের দল বাঁধিয়া চলার কথা বোধহয় সকলেই জান। বড় বড় শিংওয়ালা হরিণগুলি যখন প্রকাণ্ড দল বাঁধিয়া নদী পার হইতে থাকে, সে নাকি এক চমৎকার দৃশ্য। নদীর এপার হইতে ওপার পর্যন্ত কেবল হরিণের মাথা আর হরিণের শিং। মনে হয় যেন জীবন্ত সাঁকো ফেলিয়া নদীর জলে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। পাঁচ দশ হাজার হরিণ এইরূপে একসঙ্গে বাহির হয়। প্রায়ই দেখা যায় তাহারা এমন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে যাতায়াত করে যে, শিকারীরা আগে হইতে আন্দাজ করিয়া সময়মতো ঠিক জায়গায় খাপ পাতিয়া বসিয়া থাকে।

কিন্তু জানোয়ারের বিদেশযাত্রার কথা বলিতে গিয়া যদি কেবল বড় বড় জানোয়ারের কথাই বলি, তবে আসল কথাটাই বাদ থাকিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে যত আশ্চর্য কথা শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে লেমিঙের কথা।

পাহাড়ের ধারে যেখানে সবুজ গাছ আর কচি পাতার অভাব নাই, সেইখানে গর্ত করিয়া লেমিং বাস করে। দেখিতে তাহারা ইঁদুরের চাইতে বড় নয়, চেহারাও সেইরকম—কেবল লেজ নাই বলিলেই হয়। আর বিশেষ আশ্চর্য তাহাদের বংশবৃদ্ধি। যেখানে আজ দেখিবে ক্বচিৎ দু-দশটা লেমিং দেখা যায়, বৎসরেক বাদে গিয়া দেখিবে লেমিঙের বংশে পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে। সংখ্যায় যত বাড়ে, তত তাহারা গাছপালা খাইয়া শেষ করে। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, আর সবজি জোটে না। পাহাড়কে পাহাড় একেবারে নেড়া হইয়া যায়। তখন ঘোর দুর্ভিক্ষের মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায়। মনে হয়, যেন তাহাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন চলিয়াছে, যেন তাহারা কোনোরূপে পরামর্শ স্থির করিতে পারিতেছে না। তারপর একদিন কি ভাবিয়া তাহারা একেবারে দলেবলে পাগলের মতো দেশ ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে।



সে এক দেখিবার মতো জিনিস। লক্ষ লক্ষ ইঁদুর একেবারে পাহাড় কালো করিয়া নামিতে থাকে। কোথায় যাইবে, কোথায় খাবার মিলিবে সে খবর কেহ জানে না অথচ একেবারে নিরুদ্দেশ অন্ধের মতো সকলে হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হয়। বাধা মানে না, বিপদ মানে না, সব হুড়্‌হুড় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। ঠেলাঠেলিতে পায়ের চাপে কত হাজার হাজার মারা পড়ে, অনাহারে পথের ধারে আরও কত হাজার মরিয়া থাকে। আর নদীর স্রোতে, সমুদ্রের ঢেউয়ে কত যে প্রাণ হারায়, বুঝি তাহার আর সংখ্যা হয় না। যত রাজ্যের মাংসাশী শিকারী পাখি তখন চারিদিক হইতে আকাশ অন্ধকার করিয়া আসিতে থাকে। এমনি করিয়া অজস্র লেমিং বিনষ্ট হইবার পর যে-কয়টি অবশিষ্ট থাকে, তাহারাই আবার আর কোনোখানে নূতন করিয়া বংশ-সৃষ্টির সূত্রপাত করে। ক্রমে আবার সেই সংখ্যাবৃদ্ধি, সেই দুর্ভিক্ষ আর সেই প্রলয়কাণ্ড!

ছোটর কথা বলিলাম, এখন আরও ছোটর কথা বলিয়া শেষ করি। পিঁপড়ারা যে বাসা ছাড়িয়া নূতন দেশের সন্ধানে বাহির হয়, ইহা সকল দেশেই দেখা যায়। এ বিষয়ে সকলের চাইতে ওস্তাদ যে পিঁপড়া তাহার নাম ড্রাইভার পিঁপড়া। আফ্রিকার জঙ্গলে ইহারা যখন ঠিক সৈন্যদলের মতো শৃঙ্খলায় সার বাঁধিয়া চলিতে থাকে, তখন জানোয়ার মাত্রেই তাহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া পালায়।

আর পঙ্গপালের কথা কে না জানে! যে দেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়, সে দেশের চাষারা মাথায় হাত দিয়া হায় হায় করিতে থাকে। সে দেশে শস্য আর গাছের পাতা বড় বেশি অবশিষ্ট থাকে না। দশ বিশ মাইল লম্বা পঙ্গপালের দল ত সচরাচরই দেখা যায়; এক-একটা দল এত বড় থাকে যে মাথার উপর দিয়া সপ্তাহখানেক উড়িয়াও তাহার শেষ হয় না। আফ্রিকায় এইরকম বড় বড় কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সেখানে পঙ্গপালের চাপে পড়িয়া টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া পড়ে, পুকুর বুজিয়া যায়, ড্রেন আটকাইয়া যায়, এমনকি রেলগাড়ি বন্ধ হইয়া যায়, এমনও দেখা গিয়াছে।

জানোয়ারের ঘুম

এক-একজন মানুষের ঘুমাইবার ধরন দেখি এক-একরকম। কেউ চুপচাপ নিরীহভাবে জড়োসড়ো হইয়া ঘুমায়, কেউ ঘুমের মধ্যে হাত পা ছুঁড়িয়া এপাশ ওপাশ করিয়া অস্থির হয়, কেউ বা তুমুল নাসিকাগর্জনে রীতিমতো যুদ্ধের কোলাহল সৃষ্টি করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে এক-একজন লোক দেখি, তাহাদের আর কোনো ক্ষমতা থাক বা নাই থাক, ঘুমাইবার শক্তিটা খুব অসাধারণ। যেখানে সেখানে উঠিতে-বসিতে তাহারা বেশ একটু ঘুমাইয়া লয়। পাখা-কুলি পাখা টানিতে টানিতে ঘুমাইয়া পড়ে, পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে পড়াইতে ঢুলিতে থাকেন, আর ছোট ছোট ছেলেরা গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমের ঘোরেই হুঁ হুঁ করিতে থাকে। যুদ্ধের সময়ে ক্রমাগত কয়েকদিন রাত জাগিয়া এবং হয়রান হইয়া সৈন্যেরা যখন শিবিরে ফিরে, তখন অনেক সময় দেখা যায় তাহারা চলিতে চলিতেই ঘুমের ঘোরে মাতালের মতো টলিতেছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিষ্যবাড়ি গিয়াছিলেন—শীতের সময়ে। সেখানে পাড়াগাঁয়ে শীতটা কি রকম হয় তাঁহার জানা ছিল না। তাই শিষ্য যখন লেপ দিতে চাহিল তখন তিনি বারণ করিয়া বলিলেন, "আমার শীত-টিত কিছু লাগে না।" কিন্তু 'লাগে না' বলিলেই ত আর শীত দূর হয় না; কাজেই রাত্রে যখন ঠাণ্ডা বাড়িয়াই চলিল তখন ঠাকুর মহাশয়ের দুরবস্থা কেমন হইয়াছিল, শিষ্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন অতি চমৎকার—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী।
চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলি।"

প্রথমে ঢেঁকির মতো সটান সোজা, তারপর ক্রমে ধনুকের মতো বাঁকান, তারপর কুকুরের মতো হাত পা গুটাইয়া জড়োসড়ো, তারপর শীতে তাল পাকাইয়া একেবারেই পুঁটুলির মতো গোল।

জানোয়ারদের ঘুমের কায়দা যদি দেখ, তবে ইহার চাইতেও অনেক বেশি রকমারি পাইবে। কেহ চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া থাকে। কেহ দিনে জাগিয়া রাত্রে ঘুমায়, কেহ প্যাঁচার মতো নিশাচর হইয়া সারারাত জাগিয়া কাটায়। আস্তাবলে ঘোড়াগুলি খাড়া দাঁড়াইয়া ঘুম দেয় কিন্তু মহিষ বা গণ্ডার কাদা জলে গলা পর্যন্ত ডুবাইয়া আরাম করিয়া ঘুমায়। চিড়িয়াখানায় কতগুলি বাঁদর দেখিয়াছি তাহারা দল বাঁধিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া একসঙ্গে বসিয়া ঘুমাইতেছে, আবার কোনো-কোনোটা দেখি ঠিক মানুষের মতো শুইয়া হাত পা এলাইয়া ঘুমায়। একটা ওরাংওটান দেখিয়াছিলাম, সে একটি দোলনার উপর পেটের ভর দিয়া হাত পা ঝুলাইয়া ঘুমাইতেছিল। ইহাতে তাহার যে কিছুমাত্র অসুবিধা হইতেছে এরূপ বোধ হইল না। অনেক জন্তুই ঘুমাইবার সময় ঠাণ্ডা ছায়া খোঁজে, কিন্তু নদীর ধারের কুমিরগুলি দুপুর রোদের চড়ায় পড়িয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইয়া থাকে। আবার কত জন্তু আছে, তাহারা শীতকালটা বা গ্রীষ্মের গরমটা কুম্ভকর্ণের মতো লম্বা ঘুম দিয়া কাটায়। ভল্লুক সাপ ব্যাং গেঁড়ি প্রভৃতি কোনো কোনো জন্তু এ বিদ্যায় বেশ পাকা ওস্তাদ ; পরিষ্কার দিন হইলেই কাঠবিড়ালিগুলি রোদে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, কিন্তু ঠাণ্ডা মেঘলা দিন দেখিলে তাহারা অনেকেই গাছের ফাটলে বা কোটরে ঢুকিয়া ঘুমাইতে থাকে—আবার পরিষ্কার রোদ না হওয়া পর্যন্ত সে ঘুম ভাঙিতে চায় না। যে-সকল জন্তু এইরকম লম্বা লম্বা ঘুম দেয়, ঘুমের সময় তাহারা দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ না খাইয়া কাটায়। এই সময়ে তাহাদের শরীরটা প্রায় অসাড় নিষ্কর্মা হইয়া পড়ে—এমনকি নিশ্বাস-প্রশ্বাসও অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে। এইরকম লম্বা ঘুমের পর তাহারা যখন আবার বাহির হয় তখন দেখা যায় যে শরীরের চর্বি শুকাইয়া তাহাদের চেহারা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িয়াছে।



জাগুয়ারের নাগালের বাইরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে শ্লথ।

পাখিরা কেমন করিয়া ঘুমায় দেখিয়াছ ত ? কাকাতুয়া যেমন দাঁড়ে বসিয়া ঘুমায়, সেইরকম অনেক পাখিই গাছের উপর খাড়া বসিয়া ঘুমায়। কেহ কেহ বা পা মুড়িয়া মাটির উপর চাপিয়া বসিয়া ঘুমায়। বক যে এক ঠ্যাঙে দাঁড়াইয়া চমৎকার ঘুমাইতে পারে তাহা সকলেই জান। প্যাঁচা প্রভৃতি কোনো কোনো পাখি ঘুমাইবার সময় গায়ের পালক ফুলাইয়া নিজেদের শরীরটা প্রায় দ্বিগুণ বড় করিয়া তোলে। এক রকম চন্দনা আছে তাহারা ঠিক বাদুড়ের মতো গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া ঘুমায়। বাদুড় কেমন করিয়া ঘুমায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—তাহারা মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ডানা মুড়িয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গাছের ডাল হইতে ঝুলিয়া থাকে। সে এক চমৎকার দৃশ্য। শীতের সময়ে কলিকাতার ইডেন গার্ডেন্‌সে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক দেখিয়াছি। বাদুড়েরা নাকি দিনের বেলায় ঘুমায়, কিন্তু এগুলি যেরকম ক্যাট্ ক্যাট্ শব্দ আর ছট্‌ফট্ করিতেছিল তাহাই যদি ঘুমের নমুনা হয়, তবে না জানি সে কি রকমের ঘুম। ঘুমাইবার পূর্বে বাদুড়েরা যে রকম ঘটা করিয়া ঘুমের আয়োজন করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই হাসি পায়। লম্বকর্ণ বাদুড় বা চামচিকা ঘুমাইবার সময় প্রথমেই গাছের ডাল আঁকড়াইয়া ঝুলিয়া পড়ে তারপর ডানা দুইটি দু-চারবার ঝাড়িয়া খুব সাবধানে ভাঁজ করিয়া বন্ধ করে। তারপর ফট্ করিয়া একটি প্রকাণ্ড কান মুড়িয়া যায়; খানিক বাদে সে আর একটি কানও ঠিক ঐরকম হঠাৎ গুটাইয়া লয়—তখন আর তাহাকে চিনিবার জো থাকে না। বাদুড়ের কথা বলিতে গিয়া আরেকটা জন্তুর কথা মনে হয়, সে নিজেকে রীতিমতো 'বেনের পুঁটুলি' পাকাইয়া ঘুমায়। তখন তাহাকে দেখিলে হঠাৎ জানোয়ার বলিয়া চিনিতে পারাই অসম্ভব। মনে হয়, যেন একটা প্রকাণ্ড ফল বা মৌচাক ঝুলিয়া আছে। এই জন্তুর নাম কোবেগো। দেখিতে কতকটা বাদুড়ের মতো হইলেও এটি বাদুড় নয় এবং ইহার ডানাটাও বাদুড়ের ডানার মতো ছড়ানো নয়। বাদুড়ের মতো উড়িতে না পারিলেও ইহারা এই ডানায় ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া ১০০/১৫০ হাত পার হইয়া যায়। ইহাদের ছানাগুলি বাঁদরের ছানার মতো সবসময়ে মায়ের বুক আঁকড়াইয়া থাকে। এইরকম পুঁটুলি পাকাইবার অভ্যাসটা 'বর্মধারী' বা 'আর্মাডিলো' প্রভৃতি আরও কোনো কোনো জন্তুর মধ্যে দেখা যায়।

মাথা ঝুলাইয়া ঘুমান যাহাদের অভ্যাস, তাহাদের মধ্যে আর একজনের কথা বলিয়া শেষ করি। ইহার ইংরাজি নাম 'শ্লথ' অর্থাৎ অলস। বাস্তবিক এমন ঢিলা স্বভাবের অলস জন্তু আর বড় দেখা যায় না। গাছের ডালে ঝুলিয়া ঝুলিয়া আর অকাতরে ঘুমাইয়া ইহারা সারা বছর কাটাইয়া দেয়। চিৎ হইয়া মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকায়, মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া গাছের পাতা খাওয়া, আর যখন তখন ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমান—ইহাই যেন ইহাদের জীবনের কাজ। যখন এক ডালের পাতা ফুরাইয়া গেল তখন আর এক ডালে যাওয়াটা যেন ইহাদের পক্ষে প্রাণান্তকর। ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া ভুঁড়ি দুলাইয়া, আস্তে আস্তে হাত পা বাড়াইয়া আধ মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় সারিতে না সারিতে ইহারা আবার পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। বাস্তবিক ইহারা এমন অলস যে অনেক সময় ইহাদের মাথায় এক রকমের শেওলা গজাইয়া সবুজ রঙের স্যাঁতলা পড়িয়া যায়। পুরাণে বলে, বাল্মীকি, চ্যবন প্রভৃতি ঋষিরা ধ্যানে বসিলে তাঁহাদের গায়ে উইয়ের ঢিপি গজাইয়াছিল। ইনি সারাদিন চিৎপাত হইয়া যে কিসের ধ্যান করেন তাহা জানি না—কিন্তু মাথায় শেওলা না গজাইয়া আরেকটু বুদ্ধি গজাইলে বোধ হয় কতকটা সুবিধা হইত।

গোখুরো শিকার

এক সাহেবের আস্তাবলে ইঁদুরে বাসা বেঁধেছিল। তারা আস্তাবলের মেজের নীচে গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরার মতো করে ফেলেছিল। ইঁদুরের উৎপাতে সবাই ব্যতিব্যস্ত, কতদিন কল পেতে কত ইঁদুর ধরা পড়ল, তবু ইঁদুর আর ফুরায় না। তখন সাহেব ভাবলেন ইঁদুর মারবার বিষবড়ি না বানালে আর চলছে না। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ একদিন দেখা গেল, আস্তাবলের সব ইঁদুর কোথায় পালিয়েছে। সবাই বলল, "ব্যাপারখানা কি?" দুদিন না যেতেই বোঝা গেল, ব্যাপার বড় গুরুতর—ইঁদুরের গর্তে প্রকাণ্ড দুই গোখুরো সাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। আস্তাবলে মহা হুলুস্থূল পড়ে গেল, সহিস কোচম্যান সব চলতে-ফিরতে সাবধানে থাকে, রাত্রে গাড়ি জুততে হলে লোকজন, লাঠি, মশাল নানা রকম হাঙ্গামার দরকার হয়, তা নইলে কেউ ঘরে ঢুকতেই চায় না। সাহেব দেখলেন মহা মুশকিল, এর চাইতে ইঁদুরই ছিল ভাল।

সাহেবের যে চাপরাসী, সে লোকটি ভারি সেয়ানা—সে বললে, "হুজুর, আমি সাপ তাড়াবার ফন্দি জানি। আমায় চার আনা পয়সা দিন, আমি এখুনি তার সরঞ্জাম কিনে আনছি।" পরের দিন চাপরাসী সেই চার আনার সরঞ্জাম নিয়ে হাজির—একটা বঁড়শি আর ছিপ আর একটা ঠোঙার মধ্যে জ্যান্ত একটা ব্যাং। দেখে সবাই হাসতে লাগল আর চাপরাসীকে ঠাট্টা করতে লাগল। সাহেব বললেন, "বেঅকুফ! তোকে সাপ মারতে বললাম, আর তুই মাছ ধরবার সরঞ্জাম এনে হাজির করলি!" চাপরাসী সেসব কথায় কান না দিয়ে ব্যাংটাকে বঁড়শিতে গেঁথে আস্তাবলের দিকে চলল; তামাশা দেখবার জন্য সবাই তার পিছনে পিছনে চলল। তারপর সেই ছিপে-গাঁথা ব্যাংটাকে গর্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চাপরাসী শক্ত করে ছিপের গোড়ায় ধরে বসে রইল। খানিক পরে ছিপে টান পড়তেই অমনি সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর চাপরাসী সেই আধ-গেলা ব্যাংসুদ্ধ একটা প্রকাণ্ড সাপকে গর্তের মধ্যে থেকে হিড়হিড় করে টেনে বার করল। সাপেরা যখন খায় তখন তারা ক্রমাগত গিলতেই থাকে, যা একবার গলার মধ্যে ঢোকে তাকে আর ঠেলে বার করতে পারে না। কাজেই ছিপের আগায় বঁড়শি, বঁড়শিতে গাঁথা ব্যাং আর ব্যাঙের সঙ্গে সাপ; এমনি করে গোখুরোমশাই চার আনার সরঞ্জামে ধরা পড়লেন। তারপর লাঠিপেটা করে তাকে সাবাড় করতে কতক্ষণ?

একটা সাপ মারা পড়তেই আরেকটাকে ধরবার জন্য সকলের ভারি উৎসাহ দেখা গেল। কিন্তু একদিন দুদিন করে এক সপ্তাহ গেল, তবু সাপ আর ধরা দেয় না। সবাই হয়রান হয়ে পড়ল। সাহেব যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, এমন সময় একটা চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল—সাপ ধরা পড়েছে। সাহেব



সাপের বিষ নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা চলছে, তাই অশিক্ষিত সাপুড়ের বদলে শিক্ষিত মানুষও সাপ ধরার বিপজ্জনক কার্যে লিপ্ত হয়েছেন।

ছুটে দেখতে গেলেন, গিয়ে দেখেন সাপ তখনও গর্ত থেকে বেরোয়নি। চাপরাসী ছিপ নিয়ে টানাটানি করছে। তারপর টানতে টানতে ক্রমে সাপের খানিকটা গর্তের বাইরে এসেছে, এমন সময় চাপরাসীর টানে ব্যাংটা তার গলা থেকে পিছলিয়ে বেরিয়ে এল। আর সাপটাও ফোঁস্ ফোঁস্ করতে করতে ছুটে আস্তাবলের বাইরে চলল। তখন সবাই তার পিছনে ছুটে লাঠি দিয়ে তাকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শেষ করল। কিন্তু কি আশ্চর্য, লাঠিপেটা করতেই তার পেটের মধ্যে থেকে কতগুলো ব্যাং বেরিয়ে পড়ল। তার মধ্যে দু-একটা তখনও বেঁচে ছিল—একটা ত একটু বাদেই লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। সাহেব ত এই কাণ্ড দেখে একেবারে অবাক। সাপের পেটে গিয়েও যে কোনো জন্তু বেঁচে থাকতে পারে, এটা তাঁর জানাই ছিল না। কিন্তু সাহেবের জানা না থাকলেও এটা কিছু নতুন খবর নয়। আমেরিকায় 'শিংওয়ালা' সাপের সম্বন্ধেও এই রকম গল্প শোনা যায়। সেই সাপগুলো এমন পেটুকের মতো খায় যে খাবার পরে আর তাদের নড়বার শক্তি থাকে না, তখন তারা যেখানে সেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে। সেখানকার প্রাচীন 'রেড ইণ্ডিয়ান' জাতির লোক এই সময়ে তাকে দেখতে পেলে তার মাথায় ডাণ্ডা-পেটা করতে থাকে। তার ফলে অনেক সময়েই তার পেট থেকে আস্ত-গেলা জন্তুগুলো সব বেরিয়ে আসে। তার মধ্যে প্রায়ই দু-একটাকে জ্যান্ত পাওয়া যায়।

যাহোক, সাহেব ত সাপ মারলেন। কিন্তু তখন আবার দেখা গেল যে, আস্তাবলের মেঝের নীচে সাপের ছোট ছোট বাচ্চায় একেবারে ভরতি হয়ে গেছে। এখন উপায় কি? দুটো সাপ মারতেই এত হাঙ্গাম, তবে এতগুলো যখন বড় হবে তখন কি হবে? আবার চাপরাসীর ডাক পড়ল। চাপরাসী বলল, "হুজুর! আমি এরও উপায় জানি।" এবারের উপায়টি আরও আশ্চর্য। এবার প্রকাণ্ড বড় বড় কোলা ব্যাং এনে আস্তাবলে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। তারা মহা ফুর্তি করে পেটভরে খেয়ে খেয়ে সাপের বংশ সাবাড় করে দিল। সাপকে দিয়ে ব্যাং খাইয়ে, তারপর ব্যাংকে দিয়ে সাপ গেলানো! চমৎকার শিকার, না?

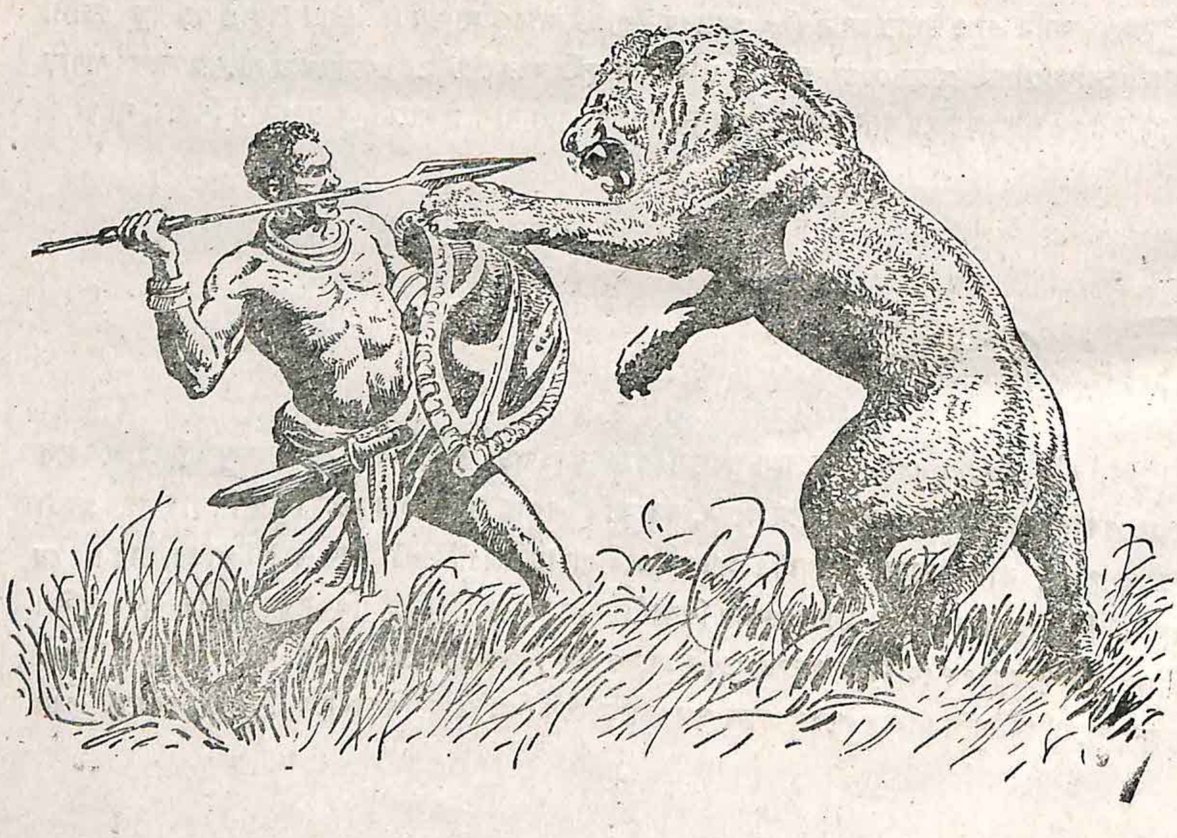
সিংহ শিকার

আফ্রিকা হ'ল সিংহের দেশ, ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় শিকারীরা সেখানে বন্দুক নিয়ে দলেবলে সিংহ শিকার করতে যান। তাঁরা মনে করেন, যত রকম শিকার আছে তার মধ্যে সিংহ শিকার খুব একটা বড় ব্যাপার; কারণ তাতে শিকারীর সাহস এবং বাহাদুরির পরিচয়টা ভাল করেই পাওয়া যায়। যে শিকারী সিংহ মেরেছে লোকে তাকে ওস্তাদ শিকারী বলে মানে। সিংহ শিকারের বিপদ খুব বেশি। আজকাল বন্দুকের এত যে উন্নতি হয়েছে, তবুও এখনও কত শিকারী সিংহের হাতে প্রাণ হারান। তিন-চারটা সাংঘাতিক গুলি খাবার পরেও একশ গজ দৌড়ে এসে সিংহ তার শিকারীকে শিকার করেছে, এমন

ঘটনার কথাও শোনা যায়। তার মধ্যে একটি গুলি সিংহের হৃৎপিণ্ড ফুটো করে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবু মরবার আগে সে তার মরণ-কামড়টি না দিয়ে ছাড়েনি! তাহলে ভাব সিংহ কি জিনিস!

এমন যে সিংহ, তাকে আফ্রিকার 'মাসাই' ও 'নান্দি' জাতের নিগ্রোরা বল্লম দিয়ে শিকার করে থাকে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং অসাধারণ মনস্বী লোক বলে সকল দেশে পরিচিত, কিন্তু শিকারী হিসাবেও তাঁর প্রতিপত্তি বড় কম নয়। তিনি নান্দিদের সিংহ শিকার স্বচক্ষে দেখে তার যে বর্ণনা লিখে গিয়েছেন, তা পড়লে অবাক হতে হয়।

নান্দিদের শিকার দেখবার জন্য তিনি একদিন আফ্রিকার জঙ্গলে দলেবলে সিংহের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। কথা ছিল, সিংহ পাওয়া গেলে নান্দিরা শিকার করবে; সাহেবরা কেউ সে শিকারে যোগ দেবেন না, কিছু বলতে পারবেন না; তাঁরা কেবল দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখবেন। ঝোপ জঙ্গল ঘেঁটে অনেক খোঁজার পর প্রকাণ্ড এক সিংহ পাওয়া গেল। তেমন সিংহ সচরাচর মেলে না। রুজভেল্ট লিখেছেন, সিংহটাকে দেখে তাঁদের শিকার করবার লোভ জেগে উঠছিল, কিন্তু তাহলে তাঁদের কথা রক্ষা হয় না, আর নান্দিদের শিকারটাও দেখা হয় না; তাই তাঁরা দলেবলে সিংহটাকে ঘিরে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নান্দিরা একটু পিছনে পড়েছিল, দেখতে দেখতে তারা এসে হাজির হ'ল। এক হাতে বল্লম, আর এক হাতে ঢাল—বিশাল দেহটি যেন কালো পাথরে তৈরী, মুখে দয়া-মায়া দ্বিধা ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সিংহ পাওয়া গিয়েছে শুনে তাদের আনন্দ দেখে কে? তারা এক-এক পা চলে আর এক-একটি বিরাট লাফ দেয়। দেখতে দেখতে সিংহের ঝোপটিকে তারা নিঃশব্দে ঘেরাও করে ফেলল



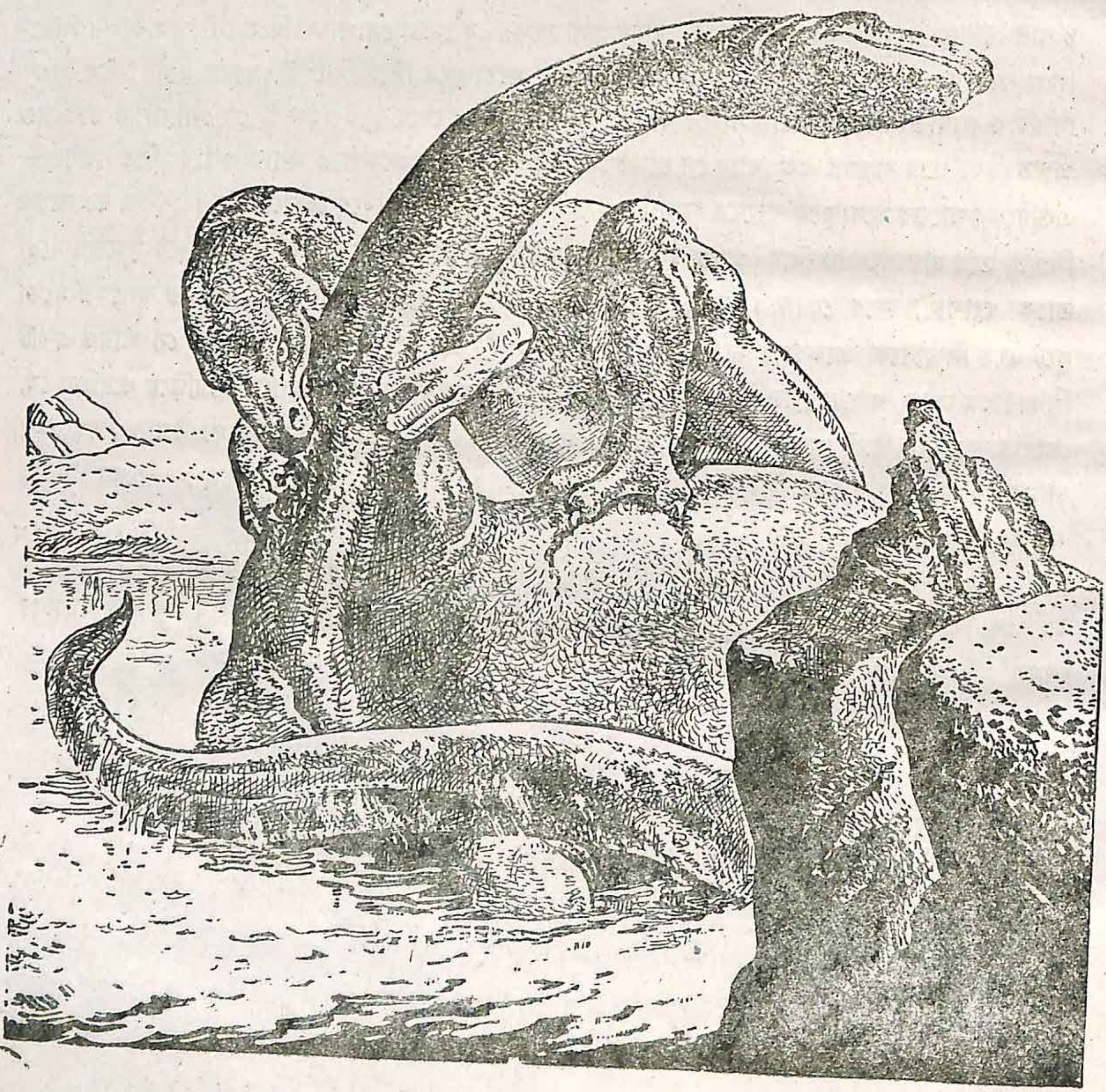
সিংহটাও এতক্ষণ চুপ করে ছিল না। সে ঝোপের আড়ালে বসে ছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেখল কতকগুলো মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তারা সব ঢালের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বল্লম বাগিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এক-একটি ঢালের উপর দিয়ে এক-এক জোড়া কালো চোখ যমের ভ্রূকুটির মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বেশ বুঝল যে তার জন্যই এত সব আয়োজন, তার ঘাড়ের কেশর খাড়া হয়ে দাঁড়াল, তার মুখখানা ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেল, তার ল্যাজের বাড়িতে সমস্ত ঝোপটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে একবার এপাশ ফিরল, একবার ওপাশ ফিরল, ডাইনে তাকাল বাঁয়ে তাকাল, কোনদিকে লোক কম দেখে তারপর তীরের মতো সেইদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটি লোকও সেদিক থেকে সরল না। সব ঢাল বাগিয়ে বল্লম তুলে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। দু'পাশ থেকে শিকারীরা বল্লম হাতে দৌড়ে এল, দলের যে নেতা সে লাফ দিয়ে দৌড়ে সকলের সামনে গিয়ে পড়ল। তার হাত থেকে বল্লমখানি বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে সিংহের গায়ের মধ্যে বিঁধে গেল। সিংহটাও আঘাত লাগামাত্র তার সামনে যাকে পেল তাকেই আক্রমণ করে ধরল। সে লোকটাও তার জন্য প্রস্তুত ছিল, তার বল্লমের এক ঘায়ে সে চক্ষের নিমেষে সিংহটাকে একেবারে এপার ওপার ফুঁড়ে ফেলল— একদিকের ঘাড়ের মধ্যে ঢুকে বল্লমের আগাটা অন্যদিকে পেটের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহটা তার ঢালের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড এক থাবা মেরে, তার ঘাড়ের মধ্যে নখ দাঁত বসিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। আর অমনি চারদিক থেকে বল্লমের পর বল্লম আগুনের ঝলকের মতো ছুটে এসে সিংহটাকে একেবারে অস্ত্রে অস্ত্রে গেঁথে ফেলল। এর মধ্যেও কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে আরও একটি শিকারীকে জখম করতে ছাড়েনি। মরবার সময় একটা বল্লমকে সে এমন জোরে কামড়িয়ে ধরেছিল যে, লোহার বল্লমটা উল্টে মুচড়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গিয়েছিল। তারপর নান্দিদের উল্লাস দেখে কে! খানিকক্ষণ পর্যন্ত সিংহের চারিদিকে তাদের চিৎকার আর বিজয়-নৃত্যের ঘটা চলল। সুখের বিষয়, আহত শিকারী দু'জনেই বেঁচে উঠেছিল।

সিংহের তেড়ে-আসা থেকে এত কাণ্ড শেষ হওয়া পর্যন্ত দশ সেকেণ্ডও সময় লাগেনি। সিংহের আক্রমণ, শিকারীর অস্ত্রবৃষ্টি, আঁচড়কামড় হুড়াহুড়ি আঘাত যন্ত্রণা ও মৃত্যু, ওর মধ্যেই সব এক ঝাপটায় শেষ! সিংহটা যখন পড়ল, তখন তার অবস্থাটি হয়েছিল ঠিক ভীষ্মের শরশয্যার মতো।

সেকালের লড়াই

তোমরা নানা রকম জানোয়ারের লড়াইয়ের কথা পড়েছ। কিন্তু বাস্তবিক লড়াইয়ের মতো লড়াই কাকে বলে যদি জানতে চাও তবে সেকালের জানোয়ারদের খোঁজ নিতে হয়। যেকালের কথা বলছি সে সময়ে মানুষের জন্ম হয় নি—সে প্রায় লাখ লাখ বছর আগের কথা। সে সময়কার জন্তুরা ত এখন বেঁচে নেই, তাদের খোঁজ নেবে কি করে? খোঁজ নেবার উপায় আছে?



যে-সকল পণ্ডিত নানা রকম জানোয়ারের শরীর পরীক্ষা করে থাকেন তাঁরা এক-একটা জানোয়ারের সামান্য দু-একটা হাড়, দাঁত বা শরীরের কোনো টুক্‌রা দেখে সেই জানোয়ার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলে দিতে পারেন যে শুনলে অবাক হতে হয়। সে আমিষ খায় কি নিরামিষ খায়, জলে থাকে কি ডাঙায় থাকে, দুই পায়ে চলে না চার পায়ে চলে, সে কোন জাতীয় জন্তু, এসব কথা শুধু খানিকটা কঙ্কাল পরীক্ষা করে চট্‌ করে বলা যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময়ে পাহাড় কাটতে বা মাটি খুঁড়তে গিয়ে এমন সব হাড় পাওয়া যায় যেটা আমাদের জানা কোনো জন্তুর হাড় হতেই পারে না। মনে কর, একটা পায়ের টুক্‌রা পাওয়া গেল প্রায় পাঁচ হাত লম্বা আর একটা হাতির পায়ের চেয়েও মোটা। সে হাড় আর এখন হাড় নেই, সে কোনকালে পাথর হয়ে গিয়েছে কিন্তু তার চেহারাটা সেই রকমই আছে। এইসব হাড় পরীক্ষা করে সেকালের অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য কথা জানা গিয়েছে।

মনে কর, একটা পাথর কাটতে গিয়ে তার মধ্যে একটা জানোয়ারের কঙ্কাল পাওয়া গেল—সে পাথর এক সময়ে নরম মাটি ছিল—জানোয়ারটা তার মধ্যে মারা যায়। ক্রমে সেই নরম মাটি জমে সেই হাড়গোড়সুদ্ধ পাথর হয়ে গেছে। মাটি জমে পাথর হতে হয়ত কত লাখ বৎসর লেগেছে, তারপরে কত হাজার বৎসর কেউ তার কথা জানতে পারেনি। এতদিন পরে মানুষ আবার জানোয়ারের সন্ধান পেল। পণ্ডিতেরা সেই পাথর পরীক্ষা করে হয়ত বলবেন এটা অমুক যুগের পাথর। তারপর হাড় পরীক্ষা করে জানোয়ারটার সম্বন্ধেও নানা কথা বলবেন। যদি অনেকগুলো হাড় পাওয়া যায় তবে হয়ত জানোয়ারটার একটা মোটামুটি চেহারাও খাড়া করতে পারবেন।

এই রকম করে কত অদ্ভুত জানোয়ারের যে খবর পাওয়া গেছে সে-কথা ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। প্লীসিওসরাস (অর্থাৎ 'প্রায় কুমির জাতীয়') জানোয়ারটির গলা সরু আর লম্বা ছিল আর লম্বায় প্রায় ২৫/৩০ হাত হলেও মোটের উপর নিরীহ ছিল। আরেকটা ছিল ইকথিয়োসরাস ('মাছ কুমির')। আর দুটো জানোয়ার ছিল মেগালোসরাস আর ইগুয়ানোডন; ইগুয়ানোডন দেখতে ভয়ানক বটে, কিন্তু নিরামিষভোজী, মেগালোসরাস আমিষভোজী। এরা দুজনেই হাতির চেয়ে বড় ছিল।

সেকালের কুমিরদের পিছনের পা দুটার গড়ন সাংঘাতিকরকম মজবুত—লড়াইয়ের সময় পিছনের পা দুটাই আক্রমণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করত। এদের নাম টিরানোসরাস অর্থাৎ অত্যাচারী কুমির। এরাও হাতির চেয়ে বড় ছিল।

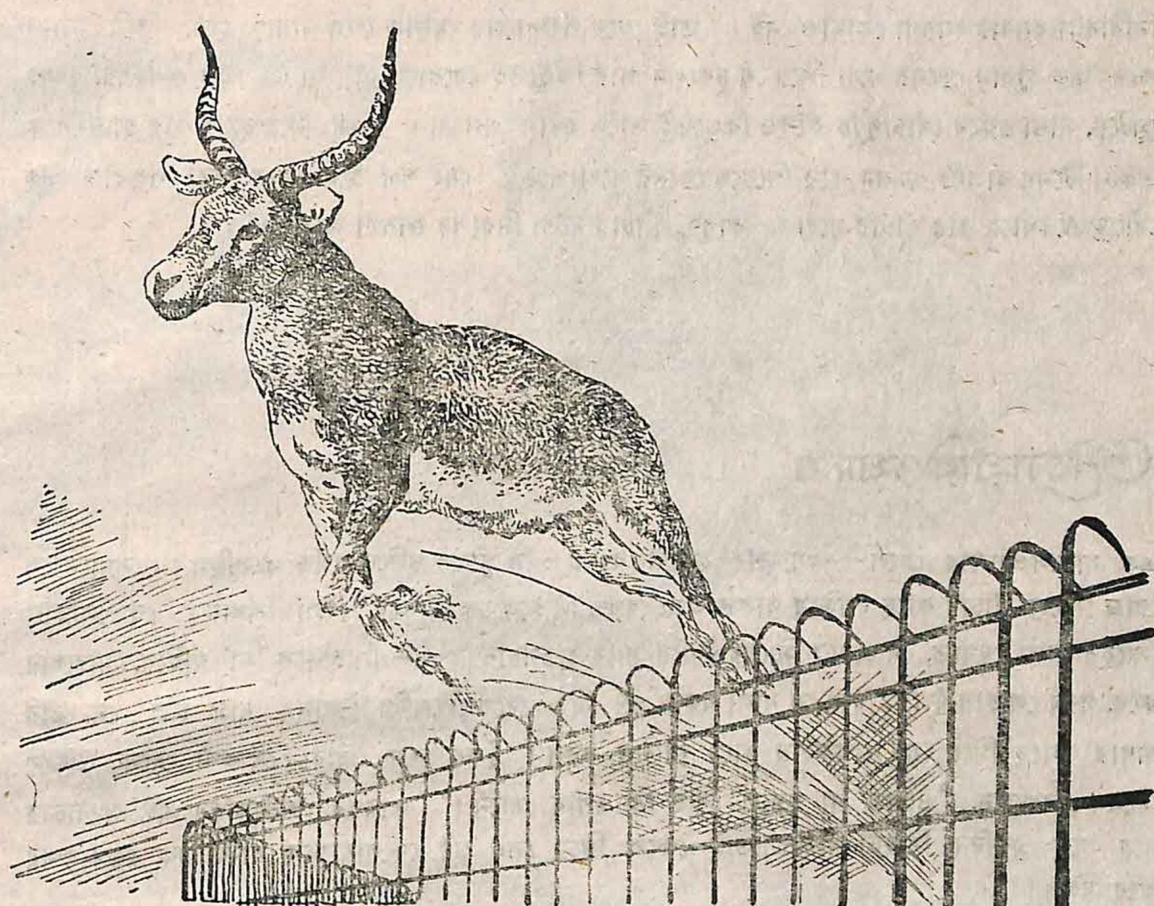
এরকম আরও কত জানোয়ার সেকালে ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। আমরা যদি তখন বেঁচে থাকতাম তাহলে কি মুশকিল হ'ত বল দেখি? এতগুলো হাতির চেয়ে বড় হিংস্র জানোয়ারের মধ্যে আমাদের দশাটা কেমন হ'ত একবার ভেবে দেখ। কয়েক বৎসর আগে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়ার জঙ্গলে সেকালের জন্তু এখনও আছে। একজন সাহেব অনেক লোকজন নিয়ে খুঁজতে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের দেখা পেলেন না।

খাঁচার বাইরে খাঁচার জন্তু

বনের জন্তুকে ধরে যখন খাঁচায় পোরা হয় তখন তার যে কি রকম দুরবস্থা হয়, সেটা বেশ সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু খাঁচার জন্তু যখন হঠাৎ ছাড়া পেয়ে বাইরে এসে পড়ে তখন তার দুরবস্থাটিও এক-এক সময় বড় কম হয় না।

লণ্ডনের এক চিড়িয়াখানার একটা রেলিং-দেওয়া বাগান-করা জমির মধ্যে কতকগুলি হরিণ থাকত। সেই ছোট্ট জমিটুকুর মধ্যে নতুন ঘর তৈরি হবে, তাই মজুরেরা সেখানে কাঠের তক্তা এনে ফেলেছিল। একদিন একটা হরিণ সেই রাশি-করা কাঠের উপর চড়ে হঠাৎ কেমন করে এক লাফ দিয়ে রেলিঙের বাইরে গিয়ে পড়েছে। হরিণ পালাচ্ছে দেখে চিড়িয়াখানার লোকেরা সব ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল ; কিন্তু হরিণ বেচারা ব্যস্ত হল তাদের চাইতে আরও অনেকখানি বেশি। যখন সে বুঝতে পারল যে রেলিঙের মধ্যে ফিরে যাবার আর কোনও উপায় নেই, তখন সে কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে পাগলের মতো চিড়িয়াখানার বাগানময় কেবল ছুটাছুটি করতে লাগল। হরিণের দৌড় দেখে বাগানের যত জন্তু সবাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বাঘ সিংহ উঠে দাঁড়াল, হরিণেরা বড় বড় চোখ মেলে যে যার ঘরে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আর বাঁদরগুলো রেলিঙে চোখ ঠেকিয়ে চেঁচাতে লাগল আর রেলিং ধরে ঝাঁকাতে লাগল। অনেক হাঙ্গামের পর, শেষটায় সেই ঘেরা জমির দরজাটা খুলে দিয়ে হরিণটাকে সেইদিকে তাড়া করে নিতে তখন সে নিজের পরিচিত আশ্রয়ে ঢুকে তারপর শান্ত হ'ল।

এক টিয়াপাখির গল্প পড়েছিলাম ; এক বাজিওয়ালার কাছে সে নানা রকমের বোলচাল শিখেছিল। যখন তামাশা দেখবার জন্যে দলে দলে লোক এসে বাজিওয়ালার তাঁবুর ধারে ভিড় করত আর ঢুকবার জন্য ঠেলাঠেলি করত, তখন টিয়াপাখিটা চিৎকার করে বলত—"আস্তে! আস্তে! ঢের জায়গা আছে! মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" একদিন টিয়াপাখির কি দুর্মতি হ'ল, সে খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে উড়ে পালাল। কিন্তু পালাবে আর কোথায়? একে ত বেচারার উড়বার অভ্যাস নেই, তার উপর খাঁচায় থেকে খাঁচাটার উপরেও কেমন মায়া হয়ে গেছে। তাই দু-একদিন এদিক ওদিক লুকিয়ে থেকে সে আবার ঘুরেফিরে সেই তাঁবুর কাছেই একটা গাছে এসে বসল। বাজিওয়ালা ততক্ষণে তাকে খুঁজে খুঁজে শেষটায় তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসেছে। এমন সময়ে উপরে ভারি একটা হৈ-চৈ গোলমাল শুনে বাজিওয়ালা বেরিয়ে এসে দেখল যে গাছের উপর টিয়াপাখিটা বসে আছে আর যত রাজ্যের পাখি এসে তার চারদিকে গোলমাল করে, তাকে ঠুকরিয়ে আর পালক ছিঁড়ে অস্থির করে তুলেছে। টিয়াপাখি বেচারা ব্যাপার দেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, আর ক্রমাগত বলছে—"আস্তে! আস্তে! ঢের



জায়গা আছে। মশায়রা অত ভিড় করবেন না।" তখন বাজিওয়ালা খাঁচাটা এনে খুলে ধরতেই বেচারা তাড়াতাড়ি তার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

পাখি বা হরিণ বা কোনো নিরীহ জন্তু না হয়ে যদি বাঘ বা সিংহের মতো হিংস্র জন্তু এই রকম ভাবে ছাড়া পেত, তাহলে ব্যাপারটা কি রকম হ'ত? হাঙ্গেরীর বুদাপেস্ত শহরে একবার একটা সিংহ সার্কাসওয়ালার খাঁচা থেকে কেমন করে বেরিয়ে পড়েছিল। সিংহ বেরিয়ে পড়েছে দেখে সার্কাসের লোকেরা হৈ-চৈ করে গোলমাল করে উঠতেই সিংহ বেচারা থতমত খেয়ে একেবারে সার্কাসের জমি পার হয়ে, সড়ক পার হয়ে, পাঁচিল টপকিয়ে এক খোলা ময়দানের মধ্যে গিয়ে হাজির। সেটা ছিল ছেলেদের খেলার মাঠ—তারা সেখানে বল খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে, হুড়োহুড়ি করছে। সিংহ বেচারার ত চক্ষুস্থির, সে এ রকম কাণ্ড আর কখনও দেখেনি। কোথায় আর যায়, সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপচাপ সরে পড়বার চেষ্টা করছে এমন সময়ে পাঁচিল টপকিয়ে সিংহওয়ালা স্বয়ং এসে হাজির। সিংহ তখন ভিড়ের মধ্যে চেনা মুখ দেখে আশ্বস্ত হ'ল, আর পোষা বেড়ালটির মতো তার মালিকের সঙ্গে আস্তে আস্তে খাঁচায় ফিরে চলল।

আর একবার আমেরিকার জানোয়ারওয়ালা বোস্টক সাহেবের এক সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়েছিল। শহরের রাস্তায় বেরিয়েই সে দেখে চারদিকে লোকজন, গাড়িঘোড়া চলাচল করছে,

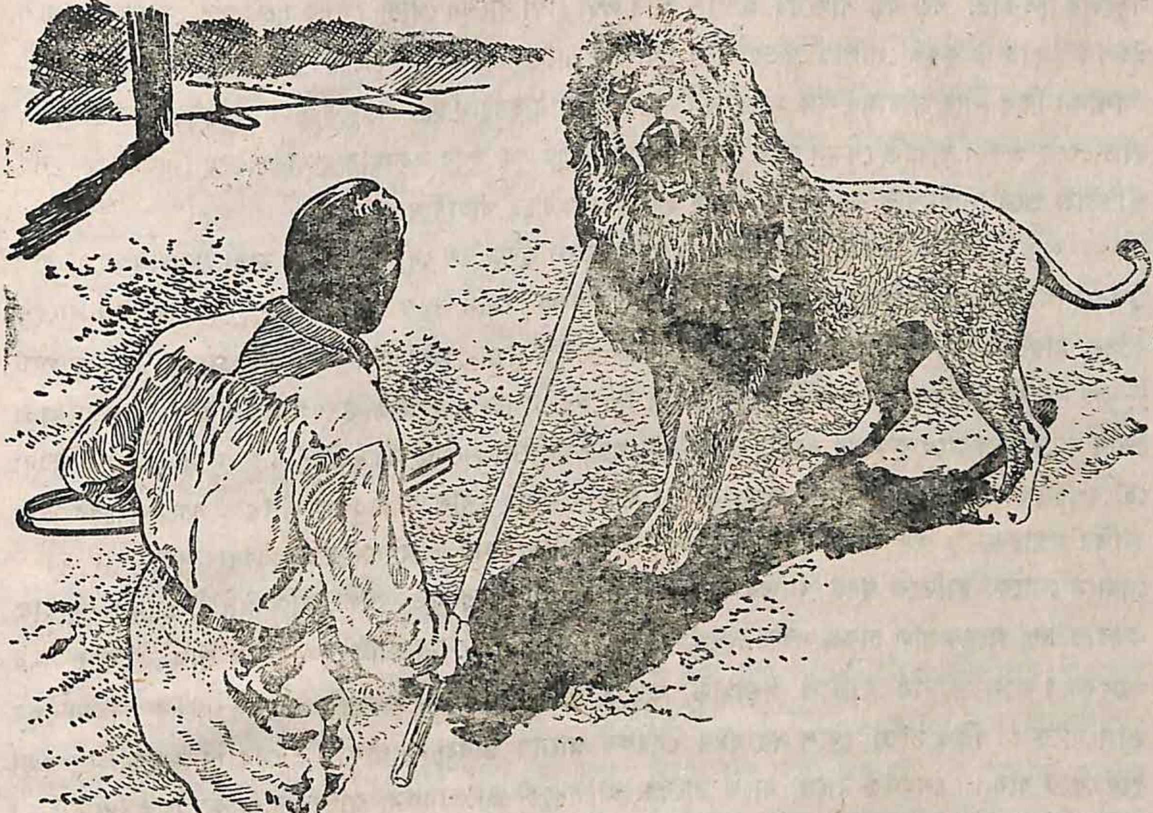
নিরিবিলি বসবার জায়গা কোথাও নেই। তাই দেখে পশুরাজের মেজাজ গেল খারাপ হয়ে, তিনি গোঁসা করে এক পুরান ড্রেনের মধ্যে গিয়ে যে ঢুকলেন আর কিছুতেই বেরোতে চান না। কুকুর লেলিয়ে, বন্দুক ছুটিয়ে, নানা রকমে খোঁচাখুঁচি করেও কিছুতেই তাকে হটান গেল না। এমন সময়ে হঠাৎ কার হাত থেকে একটা টিনের বালতি ঝম্‌ঝম্‌ করে গিয়েছে ড্রেনের মধ্যে পড়ে। সেই শব্দ শুনে চমকে উঠে পশুরাজ এক দৌড়ে একেবারে তার খাঁচার মধ্যে! কারণ, খাঁচার মতো নিরাপদ জায়গা আর নেই।

জানোয়ারওয়ালা

এক সার্কাসওয়ালার ছেলে—বয়স তার ষোলো বৎসর—সে স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। সেখানে সে রোজ সিংহের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে থাকত আর দেখত সিংহকে কেমন করে খেলা শেখায়। যে লোকটা সিংহের খেলা দেখাত, সে একটা সিংহের উপরে ভারি অত্যাচার করত—সিংহটাকে না খাইয়ে, মারধোর করে, গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সে নানা রকমে কষ্ট দিত দেখে ছেলেটির ভয়ানক রাগ হ'ল; সে তার বাবার কাছে গিয়ে সেই লোকটার নামে নালিশ করল। কিন্তু তার বাবা সে-কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন; বললেন, "ওরকম না করলে সিংহ কি পোষ মানে?" তারপর, অনেকদিন এই অত্যাচার সয়ে সয়ে একদিন সিংহটা সত্যি-সত্যিই ক্ষেপে গিয়ে সেই দুষ্ট খেলোয়াড়কে সাংঘাতিক রকম জখম করে দিল।

তখন সেই ছেলে তার বাবাকে বলল, "কাল থেকে আমি সিংহের খেলা দেখাব।" তার বাবা এ-কথা শুনে তাকে দুই ধমক দিয়ে দিলেন। কিন্তু ছেলেরও জেদ কম নয়, পরদিন সকালে দেখা গেল সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সিংহের খাঁচায় ঢুকে বসে আছে। প্রথমটা সকলে খুবই ভয় পেয়েছিল কিন্তু ক্রমে দেখা গেল যে, সিংহের সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেছে যে ভয়ের কোনো কারণ নেই। এই ছেলে এখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় 'জানোয়ারওয়ালা'। এর নাম ফ্র্যাঙ্ক বোস্টক।

একটি সিংহ নিয়ে খেলা আরম্ভ করে এখন প্রায় চল্লিশটিতে দাঁড়িয়েছে। এক-এক সময়ে পঁচিশ-ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটি সিংহকে একসঙ্গে জড়ো করে তামাশা দেখান হয়। অবশ্য সিংহগুলি সবই পোষা কিন্তু তা হলে কি হবে—তবু ত সিংহ। সিংহ কি বাঘ হাজার পোষ মানলেও তাকে ভয় করে চলতে হয়। সামান্য একটু কারণে হঠাৎ একটু ভয় পেলে বা চমকে উঠলে তারা হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলতে পারে। একবার একজন খেলোয়াড় একটা নতুন রকমের পোশাক পরে খাঁচায় ঢুকেছিল বলে তার সিংহটা তাকে তেড়ে কামড়াতে গিয়েছিল—খেলোয়াড় তখন পোশাক বদলিয়ে পুরনো পোশাক পরে এসে তারপর খাঁচায় ঢুকতে পেল। আর একবার এক মেমসাহেব একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা সিংহের খেলা



দেখাতে গিয়ে এই রকম বিপদে পড়েছিলেন। সেদিন তাঁর হাতে একটা ফুলের তোড়া ছিল, একটা সিংহ তাই দেখে বোধ হয় মাংস না কি মনে করে হঠাৎ তার উপর থাবা মেরে বসেছে। এই একটি থাবায় মেমসাহেবের গালের আর হাতের মাংসসুদ্ধ উঠিয়ে নিয়েছে আর অমনি চক্ষের নিমেষে সবক'টা সিংহ একেবারে হাঁ হাঁ করে ফুলের তোড়াটার দিকে তেড়ে এসেছে। মেমসাহেবটি তখন বুদ্ধি করে তোড়াটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাই রক্ষা, তা নইলে অতগুলো সিংহের হুড়াহুড়ির মধ্যে পড়ে তাঁকে আর বাঁচতে হ'ত না। যা হোক, ফুলটা মাটিতে পড়তেই সিংহগুলো তাকে নেড়ে শুঁকে নাক সিঁটকিয়ে আবার যে যার জায়গায় ফিরে গেল।

একবার বার্মিংহাম শহরে বোস্টক সাহেবের একটা সিংহ খাঁচা থেকে পালিয়ে শহরের রাস্তায় এসে হাজির হয়েছিল। শহরের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে গেল, রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। দোকানীরাও তাদের দোকানপাট খুলতে চায় না। সিংহটা এদিক ওদিক ঘুরে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড ড্রেনের নরদমায় গিয়ে ঢুকে বসল আর সেখান থেকে সে বেরোতে চায় না। সেই নরদমার ভিতর দিয়ে সে রাস্তার নীচে চলাফিরা করে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে। রাতদুপুরে মাটির নীচ থেকে ঐরকম গুরুগম্ভীর আওয়াজ—অবস্থাখানা কি রকম বুঝতেই পার। শেষটা নরদমার মুখে একটা খাঁচা বসিয়ে সিংহটাকে তাড়িয়ে সেটার মধ্যে নেবার কথা হ'ল। কিন্তু অনেক তাড়া করেও সিংহটাকে নড়ানো গেল না।

সকলের চিৎকার, বড় বড় পাথরের আঘাত আর লম্বা লম্বা বাঁশের খোঁচা সেসব সহ্য করে সে চুপচাপ বসে রইল। তারপর কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হ'ল, বোস্টক সাহেব নিজে তার নাকের ডগায় এক ঘা জুতো মেরে আসলেন কিন্তু সিংহ সেখান থেকে নড়ে না। সকলে যখন হয়রান হয়ে পড়েছে এমন সময় একজন লোকের হাত থেকে একটা বালতি কেমন করে ফস্কে গিয়ে গড়গড় শব্দ করে নরদমার মধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে। সেই আওয়াজ শুনে সিংহমশাই এক দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে একেবারে খাঁচার মধ্যে।

আর একবার একটা পলাতক সিংহকে পটকা ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে খাঁচার মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। সুতরাং সিংহের যেমন একদিকে খুব সাহস, আর একদিকে তেমনি ভয়ও আছে বলতে হবে। বোস্টক সাহেব বলেন, মানুষের যেমন নানা রকমের মেজাজ থাকে—কেউ ঠাণ্ডা কেউ চটা, কেউ হাবাগোছের কেউ চটপটে—এই সব জানোয়ারেরাও তেমনি। এক-একটা সিংহের চালচলন বুদ্ধি-শুদ্ধি এক-এক রকমের। কোনোটা পোষ মানে একেবারে কুকুরের মতো—কোনোটা হয়ত কোনোকালেই ঠিকমত পোষ মানে না—তাকে সর্বদা চোখে-চোখে রাখতে হয়। সিংহ পশুরাজ, তাই তার কথাই বেশি করে বললাম, কিন্তু জানোয়ারের মধ্যে হাতির সম্মানও বড় কম নয়। বিশেষত, বিলাতে ও আমেরিকায়—যেখানে হাতি সর্বদা দেখা যায় না—সেখানে লোকে হাতিকে খুবই খাতির করে। বোস্টক সাহেবের কতকগুলো হাতি আছে, তাদের তোয়াজ করবার জন্য অনেকগুলি চাকর সর্বদা লেগে আছে। আমাদের দেশে হাতিগুলো রোজ স্নান করবার সময় অনেকক্ষণ জলে কাদায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে ভালবাসে—তাতে নাকি তাদের গায়ের চামড়া খুব ভাল থাকে। কিন্তু ঠাণ্ডা দেশে সব সময় সেরকম স্নানের সুবিধা না থাকায় তাদের চামড়া শুকিয়ে কড়া হয়ে ফেটে যায়। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাদের রীতিমতো ভালোরকম স্নানের বন্দোবস্ত করে দিতে হয়। হাতির পক্ষে 'রীতিমতো স্নান' কাকে বলে, তার একটু নমুনা শোন। প্রথমে কোনো পুকুর বা বড় চৌবাচ্চার জলে হাতিটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে কয়েক ঘণ্টা থাকলে পর তাকে ডাঙায় এনে কড়া বুরুশ দিয়ে তার গায়ে কয়েক ঘণ্টা খুব করে সাবান ঘষে তাকে আবার জলে নামান হয়। তারপর আবার সাবান ঘষা, আবার জলে নামান। এই রকম তিন-চারবার করা হয়—তাতে প্রায়ই দু-চার দিন সময় লাগে, আর সাবান খরচ হয় প্রায় ২৫ সের। তারপর চামড়াটাকে আগাগোড়া এক রকম ঝামা দিয়ে ঘষে কয়েকদিন ধরে তাতে বেশ করে তেল লাগান হয়—এক পিপে জলপাইয়ের তেল। এতেও তার সখ মেটে না—এর পরে তার নখগুলি একটি একটি করে উকা দিয়ে ঘষে পালিশ করে তাকে ফিটফাট করে দিতে হয়। এই রকমে একটি হাতির পিছনে এক সপ্তাহ ধরে পাঁচ-সাতটি লোককে রীতিমতো পরিশ্রম করতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এ রকম সাংঘাতিক স্নান সব সময় দরকার হয় না—বছরে দু-চারবার করলেই যথেষ্ট।

বোস্টক সাহেবের লোক পৃথিবীর চারিদিকে জানোয়ারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। একবার একটা গরিলার ছানা বিলাতে আনা হয়েছিল—বোস্টক সাহেব অনেক দরদস্তুরের পর প্রায় ষোলো হাজার টাকায় সেটাকে কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। তার

চাইতে শিম্পাঞ্জির খেলা দেখিয়ে তিনি অনেক নাম করেছেন। তাঁরই পোষা শিম্পাঞ্জি 'কনসাল' বিলাতের বড় বড় থিয়েটারে তামাশা দেখিয়ে লোকের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'কন্‌সাল'কে বোস্টকের লোকেরা ঠিক মানুষের মতো খাতির করত। তার নিজের চাকর, নিজের থাকবার ঘর, টেবিল চেয়ার, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র সব ছিল। তাকে যখন তামাশা দেখাবার জন্য বড় শহরে নেওয়া হ'ত তখন তার জন্য রীতিমতো হোটেলের ঘর ভাড়া করা হ'ত—আলাদা শোবার ঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর ইত্যাদি। তার আদব-কায়দা খুব দুরস্ত। তার বাড়িতে যদি তার সঙ্গে দেখা করতে যাও, সে রীতিমতো চেয়ার থেকে উঠে তোমার সঙ্গে 'হ্যাণ্ডশেক' করবে, তোমাকে টুপি রাখবার জায়গা দেখিয়ে দেবে—তারপর হয়ত পেয়ালা এনে তোমার জন্যে গম্ভীরভাবে চা ঢালতে বসবে। প্রথমে যে শিম্পাঞ্জিকে বোস্টক সাহেব এইসব শিখিয়েছিলেন তারই নাম ছিল কন্‌সাল, সে অনেকদিন হ'ল মারা গিয়েছে—কিন্তু তার জায়গায় অন্য শিম্পাঞ্জিকে শিখিয়ে নেওয়া হয়েছে—তারও নাম দেওয়া হয়েছে কন্‌সাল।

প্রাচীন কালের শিকার

মানুষকে যদি কেবল জন্তু হিসাবে শরীরের গঠন দেখিয়ে বিচার করা যায়, তবে তাহাকে নিতান্তই আনাড়ি জানোয়ার বলিতে হয়। সে না পারে ঘোড়ার মতো দৌড়াইতে, না জানে ক্যাঙারুর মতো লাফাইতে; দেহের শক্তি বল, অথবা নখ দাঁত প্রভৃতি যে কোনো অস্ত্রের কথা বল, সব বিষয়েই সে অন্যান্য অনেক জানোয়ারের কাছে হার মানিতে বাধ্য। অথচ এই মানুষই এখন আর সব জানোয়ারের উপর টেক্কা দিয়া এই পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এখনকার যুগের মানুষ ত আত্মরক্ষার জন্য সহস্র রকম উপায় করিয়া রাখিয়াছে—শহর বাড়ি লোকালয় বানাইয়া সে বনের জন্তুর কাছ হইতে আশ্রয় পাইবার নানা প্রকার ব্যবস্থাও করিয়াছে। কিন্তু সেই আদিমকালের মানুষ, যার ঘরও ছিল না বাড়িও ছিল না—সে বন্দুক চালাইতে শিখে নাই, এমনকি তলোয়ার বল্লম পর্যন্ত বানাইতে পারিত না—সে কেমন করিয়া এত রকম হিংস্র জন্তুর সঙ্গে রেষারেষি করিয়া টিঁকিয়া রহিল, ভাবিতে আশ্চর্য লাগে।

সে যুগের মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ গুহাগহ্বরে, কেহ গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া বনের পশুর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিত। চলিতে ফিরিতে কত রকম হিংস্র জন্তু আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইত—তাহাদের কোনো কোনোটা এ যুগের জানোয়ারগুলির চাইতেও ভয়ানক। যেখানেই সেই প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাও—তাহারই আশেপাশে সেইসব পাথরের স্তরের মধ্যেই দেখিবে আরও কত রকম জানোয়ারের কঙ্কালচিহ্ন। এমন অবস্থায় সেকালের মানুষ যে আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে আরম্ভ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

সেকালে কথাটা খুবই অস্পষ্ট। প্রবীণ লোকেরা নিজেদের বাল্যকালের কথা বলিবার সময় বলেন 'সেকালে' এইরূপ হইত। কোনো প্রাচীন যুগের উল্লেখ করিবার সময় ইতিহাসে বলে—'সেকালে' এইরূপ হইত। কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর লুপ্ত ইতিহাস লইয়া চর্চা করেন, তাঁহাদের কাছে এ-সমস্ত নিতান্তই 'একাল'।

ইতিহাস যাহার কথা লেখে না—যে সময়ে ইতিহাস ত দূরের কথা, লিখিত ভাষারই সৃষ্টি হয় নাই, সেই কালই যথার্থ, 'সেকাল'। কত লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সেকালের মানুষ ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কবে কেমন করিয়া সে অস্ত্র গড়িতে শিখিল, কত ঝগড়া কত লড়াইয়ের মধ্যে কেমন করিয়া অল্পে অল্পে তাহার বুদ্ধি খুলিতে লাগিল, তাহার একটু-আধটু সাক্ষ্য যাহা পাওয়া যায়, তাহারই পরিচয় সংগ্রহ করিতে আজও কত পণ্ডিতের সারাটা জীবন কাটিয়া যায়।

কত যুগের কত দেশের কত রকম মানুষ। তাহারা পৃথিবীর কত দিকে চলাফিরা করিয়াছে, আর নদীর গর্ভে পাহাড়ের স্তরে তাহাদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের গুহার মধ্যে বাস করিয়া যে মানুষ কাঁচা মাংস খাইত; ভ্রুকুটি-কপাল চ্যাটাল-চোয়াল যে মানুষ দল বাঁধিয়া নরমাংস ভোজন করিত; গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া যে মানুষ আপন পরিবার লইয়া লুকাইয়া থাকিত; চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে যে মানুষ দলেবলে রাত কাটাইত; পাথরে পাথর শানাইয়া যে মানুষ অস্ত্রেশস্ত্রে পোশাক-পরিচ্ছদে সভ্য হইয়া উঠিতেছিল; বড় বড় পাথরের স্তূপচক্র গড়িয়া যে মানুষ না জানি কোন্ দেবতার পূজা করিত; তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু সংবাদ এই যুগের পণ্ডিতেরা তিল তিল করিয়া সংগ্রহ করিতেছেন।

একবার ভাবিয়া দেখ, সেই গুহাবাসীদের কথা; যাহাদের ঘরের পাশে সেকালের প্রকাণ্ড ভালুকগুলি অহরহই ঘুরিয়া বেড়াইত—প্রতিদিন চলিতে-ফিরিতে যাহারা নানা জানোয়ারের প্রচণ্ড তাড়ায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিত, অস্ত্র বলিতে পাথর ছাড়া যাহাদের আর কিছুই ছিল না, তাহারা যে নিতান্ত শখ করিয়া শিকার করিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। হয় শত্রুকে মারা না হয় শত্রুর হাতে মরা, ইহা ছাড়া তাহার কাছে আর তৃতীয় কোনো পথ ছিল না। 'ম্যামথ্' বা অতিকায় হস্তীর মতো এত বড় একটা জানোয়ারকে কাবু করা অথবা গুহা-ভল্লুক প্রভৃতি সাংঘাতিক জন্তুগুলির সহিত লড়াই করা একলা মানুষের সাধ্য নয়—সুতরাং শিকার কাজটা তাহাদের দল বাঁধিয়াই করিতে হইত। এই শিকার ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রধান সম্বল যেটি ছিল, সেটি অস্ত্রও নয় শস্ত্রও নয়—সেটি তার বুদ্ধি। দশজনে মিলিয়া আগে হইতে পরামর্শ করিয়া শত্রুকে বেকায়দায় মারিবার চেষ্টাতেই মানুষের বুদ্ধিটা খুলিত ভাল।

প্রথমত যেমন-তেমন একটা পাথর পাইলেই সে মনে করিত ভারি একটা অস্ত্র পাইলাম। ক্রমে পাথর ছুঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ত এটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে, হাতের কাছে ছোট পাথর না থাকিলে বড় পাথর ভাঙিয়া তাহাকে ছুঁড়িবার উপযোগী করিয়া লওয়া যায়। তারপর যখন হইতে সে বিবেচনাপূর্বক পাথর ভাঙিতে অভ্যাস করিল তখন হইতেই ক্রমে অস্ত্র গড়িবার নানা রকম কায়দা দেখা দিল—ঠ্যাঙাইবার অস্ত্র, গুঁতাইবার অস্ত্র, ছুঁড়িয়া বিঁধাইবার অস্ত্র, কোপাইয়া কাটিবার অস্ত্র, ভারী ভারী ভোঁতা অস্ত্র, পাথরে-খোদাই ধারাল অস্ত্র। যেদিন মানুষ আগুনকে কাজে লাগাইতে শিখিল, আর যেদিন সে নানারকম ধাতুর ব্যবহার শিখিল, সেইদিন মানুষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় দিন। সেইদিন হইতে মানুষ যথার্থরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, জগতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহ নাই।

——ঃ ঃ——